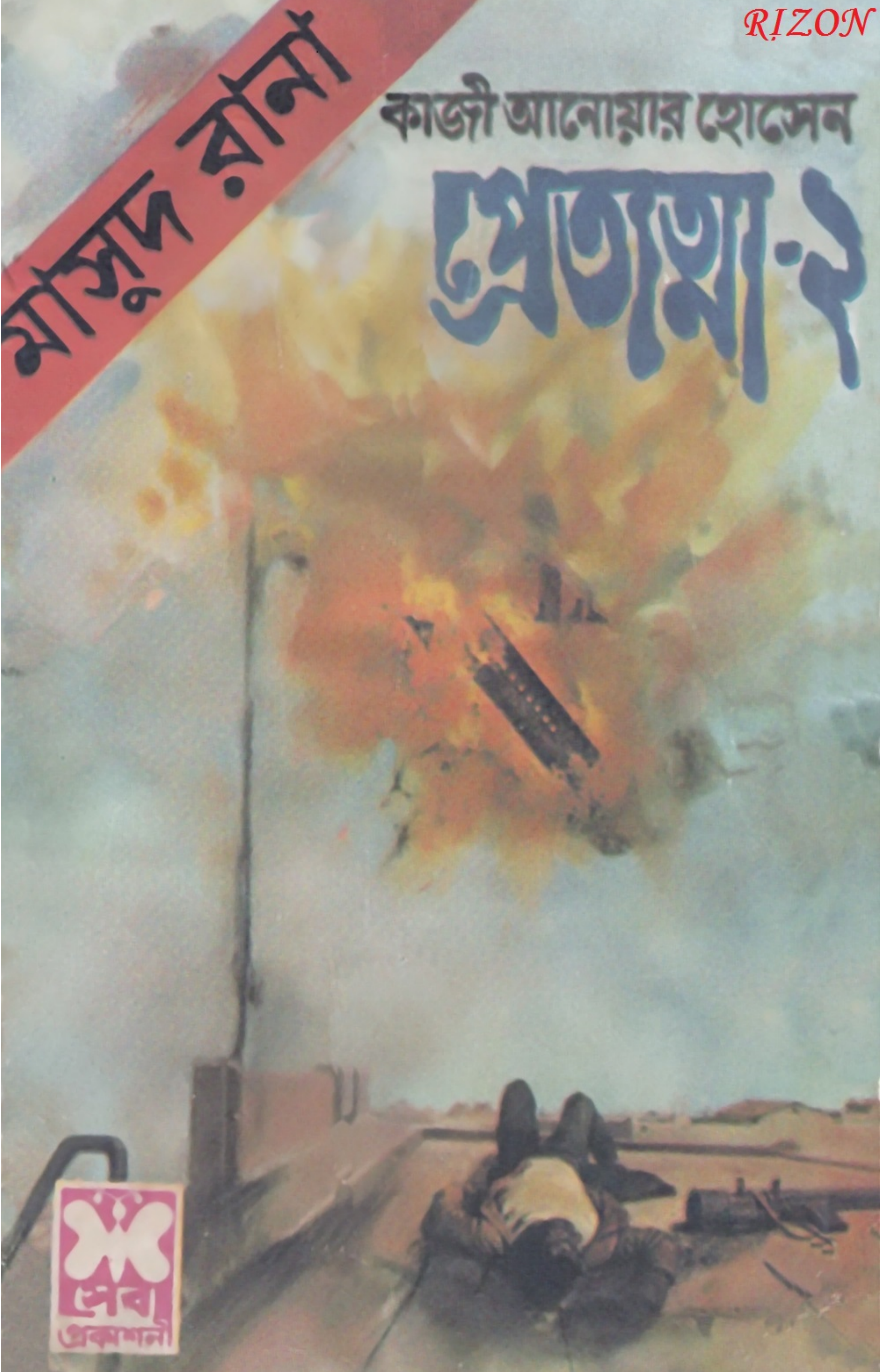

RIZON
মাসুদ রানা
কাজী আনোয়ার হোসেন
প্রেতাত্মা-২
সেবা
প্রকাশনী

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৮১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শাহাদত চৌধুরী

রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রণে :
রুহুল আমিন
পলাশ মুদ্রণ
২৪, মোহিনীমোহন দাস লেন,
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান ঢাকা-২
দূরালাপনী : ৪০৫৩৩২
জি পি ও বক্স নং ৮৫০

সেবা প্রকাশনী

PRETATMA-2
By Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
একা।
বিচিত্র তার জীবন। আশ্চর্য রহস্যময় তার গতিবিধি।
তেমনি কোমলে-কঠোরে মেশানো অদ্ভুত সুন্দর তার অন্তর।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ রোমাঞ্চ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।

আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডীবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমী
থেকে এক টানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদেরকে
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

সেবা
প্রকাশনী

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

॥ লেখক ॥

এক

কলোরাডো। রকি পার্বত্য এলাকা।

জঙ্গলের কিনারা থেকে একটু পিছিয়ে গা ঢাকা দিয়ে বসে রয়েছে কর্ণেল রেজনিক আর বেন নেলসন। লী রেফারীর বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। রেজনিকের চোখে ফিল্ড গ্লাস, বাড়ির সামনে শীলা রেফারীকে দেখতে পাচ্ছে সে। রোদে শুকানো কাপড়গুলো তুলে ভাঁজ করছে শীলা।

'শীলার দিকে এগোচ্ছেন মিঃ রানা,' বলল রেজনিক।

'স্বামীটাকে দেখতে পাচ্ছেন?' জানতে চাইল বেন।

'নিশ্চয়ই বাড়ির ভেতর কোথাও আছে,' গ্লাস জোড়া সামান্য একটু সরাল রেজনিক। 'শীলার সাথে কথা বলছেন মিঃ রানা।'

'কোল্ট ফরটি-ফাইভটা বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না তো?'

'ওটার ওপর উইণ্ডব্রেকার চাপিয়ে রেখেছেন,' সামনের দৃশ্যটা ভালো করে দেখার জন্যে ঝোপের সরু একটা ডাল বাঁকিয়ে মট্ করে ভেঙে ফেলল রেজনিক। 'বাড়ির ভেতর ঢুকছেন এখন।'

'আমাদেরও এবার এগোনো উচিত,' বলল বেন। ভাঁজ করা হাঁটু সোজা করে উঠে দাঁড়াচ্ছে সে, এই সময় রেজনিকের লোহার মতো শক্ত একটা হাত তার কাঁধে চাপ দিয়ে আবার তাকে বসিয়ে দিল।

'সাবধান! ঘুর ঘুর করছে ডাইনীটা। সাথে কেউ এসেছে কিনা দেখে নিচ্ছে।'

বাড়ির সামনে উঠোনে অলস পায়চারির ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে শীলা রেফারী, কুকুরের গলায় বাঁধা চেইনের অপর-প্রান্তটা ধরে আছে বাঁ হাতে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে জঙ্গলের কিনারা। মিনিট ছয়েক পর রাস্তার দিকে শেষ একবার তাকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়ির কোণে। একটু পরই ঘেউ ঘেউ শব্দ ভেসে এলো। প্রতিবাদের স্বরে চেঁচাচ্ছে কুকুরটা।

'আমি পিছন দিয়ে ঢুকব বাড়িতে,' বলল রেজনিক। 'আমাকে একটু সময় দিয়ে তার পর আপনি এগোবেন।'

মাথা ঝাঁকাল বেন। 'কুকুর হইতে সাবধান।'

'ওকে বোধহয় বেঁধে রেখেছে,' রওনা হয়ে গেল রেজনিক। ছোট ঢাল বেয়ে একটা নালার ভেতর নেমে গেল সে।

বাড়িটার পিছনের দরজাটা দেখতে পাচ্ছে রেজনিক, আর মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। এই সময় গুলির শব্দ শুনতে পেলো সে।

চোখের সামনে রিস্টওয়াচ তুলে সময় দেখছে বেন, আচমকা বিস্ফোরণের আওয়াজে চমকে উঠল। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল

সে। ক্ষ্যাপা গণ্ডারের মতো তীরবেগে ছুটলো ঢাল বেয়ে। চেহারায় একটা উদভ্রান্ত ভাব। রাইফেলের আওয়াজ চিনতে ভুল হয়নি। প্রায় পৌঁছে গেছে বেন, এমনি সময়ে অকস্মাৎ দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো শীলা রেফারী, বারান্দা থেকে সিঁড়ির ধাপ গড়িয়ে পড়ল গিয়ে উঠোনে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে বেন, হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে শীলার রক্তাক্ত পোশাকের দিকে। বয়স্কা মহিলা, কিন্তু সার্কাসের ট্রেনিং পাওয়া ছুকরির মতো ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল সে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে বেন, শীলার হাতে ধরা রয়েছে একটা রাইফেল।

উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরতে যাবে, এমনি সময় দেখে ফেলল সে বেনকে। বেকায়দায় ধরা রাইফেলটা সোজা করার জন্যে সময় নিল না সে। একটা হাত ব্রীচে, আরেকটা হাত ব্যারেলের ওপর, কোমরের কাছ থেকে গুলি করল শীলা।

বুলেটের ধাক্কা খেয়ে আধপাক ঘুরে গেল বেন, দড়াম করে পড়ল ঘাসের ওপর, রক্ত ভরা বেলুনের মতো ফেটে গেছে তার উরু। লাল হয়ে উঠেছে ট্রাউজারটা।

সব কিছুই স্লো-মোশন ছবির মতো ধীর লয়ে ঘটতে দেখছে যেন রানা। উইনচেস্টারের মাজ্‌ল ঝলসে উঠল ওর মুখের ওপর। প্রথমে মনে হলো, আহত হয়েছে সে। কিন্তু ছিটকে মেঝেতে পড়ার পর আবিষ্কার করল হাত-পা নাড়তে পারছে। শীলার বুলেট কানের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে, আর ওর বুলেট রাইফেলের স্টকটা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। তারপর বাঁক নিয়ে ছুটে গিয়ে একটা

কেরোসিন ল্যাম্পে লেগেছে বুলেটটা। চুরমার হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এখনো কাঁচের গুঁড়ো।

হিংস্র পশুর মতো হুংকার ছেড়ে হাতের ঝুলন্ত পাইপটা ছুঁড়ে মারল লী। রানার কানের নিচে, ঘাড়ের পাশে বাড়ি খেল সেটা। জ্বলন্ত ছাই আর আগুনের ফুলকির ছ্যাঁকা খেয়ে বিদ্যুৎ-গতিতে ঘুরে বসল রানা। সবকিছু ঝাপসা দেখছে ও। কোল্টটা তুলে একটা ধোঁয়াটে আকৃতির দিকে লক্ষ্য স্থির করছে, বুঝতে পারছে ওটাই লী।

চোখের পলকে রাইফেলের ব্যারেল নামিয়ে আনল শীলা, রানার হাতে ধরা কোল্টের ওপর পড়ল সেটা। মেঝেতে পড়ে ঠকাঠক নাচতে নাচতে সোজা গিয়ে ঢুকল পিস্তলটা ফায়ার-প্লেসের ভেতর।

রানার দিকে এগিয়ে আসছে লী। হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে টেবি-লের তলা থেকে এক হাত লম্বা একটা ফাঁপা লোহার পাইপ তুলে নিল সে। রাইফেল কক্ করছে শীলা। পাইপটা কাঁধের ওপর তুলে ধরেছে লী, রানার মাথার ওপর নামিয়ে আনছে।

বাঁ হাত তুলে মাথা আড়াল করল রানা। বাড়িটা লাগতেই থরথর করে কেঁপে উঠল শরীর, কিন্তু হাড় ভাঙার কোনো শব্দ হয়নি লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়ে গেল ও। প্রচণ্ড এক লাথি মারল সে লীর হাঁটু লক্ষ্য করে। পিঠ বাঁকা করে ঝুঁকে ছিল লী, চর-কির মতো ঘুরে গেল শরীরটা, তারপর ধপাস করে পড়ে গেল ওর ওপর।

'গুলি কর্ মাগী!' প্রচণ্ড রাগে গর্জে উঠল লী।

'কি করে !' তীক্ষ্ণ কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল শীলা। 'সামনে যে তুমি!'

পাইপটা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে লী। তার গলায় শক্ত ফাঁসের মতো জড়িয়ে আছে রানার ভালো হাতটা। ধস্তাধস্তি করছে ওরা দু'জন, আর কামরার চারদিকে নেচে বেড়াচ্ছে শীলা, উত্তেজিত ভাবে বারবার তাক করছে রাইফেল, কিন্তু রানার সামনে লীকে দেখে ট্রিগার টিপতে গিয়েও সামলে নিচ্ছে নিজেকে শেষ মুহূর্তে। লীকে ছাড়ছে না রানা, নিজের সামনে টেনে এনে একটা আড়াল হিসেবে ব্যবহার করছে তাকে, সেই সাথে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ সাপের মতো শরীরটা মোচড় দিয়ে উঠল লীর, রানার পেটে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল সে। ব্যথায় অসাড় হয়ে গেল রানার শরীর। নিজেকে মুক্ত করে নিয়েই ডাইভ দিয়ে সরে গেল লী।

মুখের চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে রানার। হাঁপাচ্ছে। আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছে, রাইফেল তুলে লক্ষ্য স্থির করতে যাচ্ছে শীলা। অসহায়ভাবে হাত দিয়ে মেঝে হাতড়াচ্ছে ও। পাইপের একটা প্রান্ত ঠেকল আঙ্গুলে। খপ্ করে সেটা ধরেই তুলে ফেলল, তারপর লক্ষ্য স্থির না করেই সমস্ত শক্তি দিয়ে মারল শীলার দিকে।

শীলার ডান বুকে রকেটের মতো গিয়ে আঘাত করল লোহার পাইপটা। কাপড় ভেদ করে থলথলে মাংসের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল শীলা, লম্বা হয়ে

থাকা পাইপটা একটু একটু করে ঝুলে পড়ছে, মাংসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঠকাস করে মেঝেতে পড়ে গেল। আহত পশুর মতো গোঙাচ্ছে শীলা। তাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল রানা, কাঁধের ধাক্কা খেয়ে প্রায় উড়ন্ত অবস্থায় চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল শীলা।

'শালা বানচোত্!' বলেই ঝাঁপিয়ে ফায়ার প্লেসের ওপর পড়ল লী, ছোঁ মেরে তুলে নিল ছাইয়ের গাদা থেকে কোল্ট পিস্তলটা, ঝট করে ঘুরল রানার দিকে। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার শব্দের সাথে ধপ্ করে কিচেনের মেঝেতে পড়ল রেজনিক, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল একটা টেবিল। চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল লী, মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্যে। পরমুহূর্তে আবার যখন রানার দিকে তাকাল সে, দেখল তার মাথার ওপর নেমে আসছে রক্তাক্ত পাইপটা। হাত তুলে মাথাটাকে আড়াল করতে চাইল লী, কিন্তু সময় পেল না। হাত দুটো অর্ধেক দূরত্ব পেরোবার আগেই পাইপটা চুরমার করে দিল তার মাথার খুলি।

ওদিকে ঘাসের ওপর বসে আছে বেন, বোকার মতো তা-কিয়ে আছে ফুটো হয়ে যাওয়া উরুর দিকে। বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মুখ তুলে তাকাল। ঠিক কি ঘটেছে আর ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে চেষ্টা করছে।

হঠাৎ ঝুলে পড়ল তার মুখ, ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে এলো শিরদাঁড়া বেয়ে। বেরিয়ে যাওয়া বুলেটের শেলটা ফেলে দিয়ে রাইফেল কক্ করছে শীলা। হাসছে সে। তাড়াহুড়ো না করে বেনের বুকের বাঁ দিকে লক্ষ্য স্থির করলো। বাঁকা হয়ে

চেপে বসছে ট্রিগারে আঙ্গুলটা।

বিস্ফোরণের আওয়াজটা কানে তালা ধরিয়ে দিল বেনের। কণ্ঠনালী ছিঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট, হাঁটু ভেঙে বেনের ওপরই পড়ে গেল শীলা। হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে আসছে গলার ফুটো থেকে। সদ্য জবাই করা গরুর মতো মাটিতে হাত-পা ছুঁড়ছে শীলা। রক্ত লেগে সবুজ ঘাসের ডগাগুলো কালচে হয়ে উঠছে।

বারান্দার রেইলিঙের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, ডান হাতে ধরা রয়েছে কোল্ট, ব্যারেলটা রিকয়েল পজিশনে তির্যকভাবে মুখ করে রয়েছে আকাশের দিকে।

বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে নামছে রানা, এই সময় কামরা থেকে বেরিয়ে এলো রেজনিক। ঘাসের ওপর বেনকে পড়ে থাকতে দেখে লাফ দিয়ে রেইলিঙ টপকাল সে, ছুটল বেনের দিকে।

বেনের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বসে আছে রেজনিক, এই সময় ওদের কাছে এসে দাঁড়াল রানা। চোখ খুলল বেন। মুখে ক্ষীণ একটু হাসি। 'সবচেয়ে খুশি হবে আমার মা। তার একমাত্র ছেলেকে বাঁচিয়েছ তুমি, দোস্ত…' কথা শেষ করতে পারল না বেন, হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলল।

দুই

নিউআর্ক, নিউজার্সি। ইউনিভার্সেল আর্মস করপোরেশন।

টার্নার ব্রুনোর সাথে তার অফিসে বসে আছে রানা। ঠিকই বলেছিল লী রেফারী, লোকটাকে দেখে অস্ত্র-ব্যবসায়ী নয়, ফেরিওয়ালা বলে মনে হয়। শরীরটা স্থূল, চেহারাটা কদাকার। তবে এখন আর সে ভাইস প্রেসিডেন্ট নয়, পদোন্নতির ফলে ইউনিভার্সেল আর্মস করপোরেশনের প্রেসিডেন্ট এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান।

রানার দিকে তীক্ষ্ণ, বিরূপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ব্রুনো। 'আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হতাম,' কর্কশ গলায় বলল সে। 'কিন্তু তার তো কোনো উপায় দেখছি না।'

'উপায় আছে,' শান্তভাবে বলল রানা। 'আপনার রেকর্ড চেক করলেই ব্যাপারটা জানা যায়।'

'অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার,' গম্ভীর হলো ব্রুনো। 'যাকে তাকে দেখানো সম্ভব নয়। আমার কাছ থেকে যারা অস্ত্র কেনে

তারা নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে চায়, যদি জানতে পারে···

'কিন্তু কার কাছে কি অস্ত্র বিক্রি করলেন তা যখন ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টকে জানাবার আইন আছে, তাহলে আর এতো রাখ রাখ ঢাক ঢাক কেন ?'

'আপনি ডিফেন্সের লোক, মিঃ রানা ?' গম গম করে উঠল ব্রুনোর গলা।

'সরাসরি না হলেও, তাই।'

'জানতে পারি আপনি কার প্রতিনিধিত্ব করছেন ?'

'দুঃখিত, তা জানানো সম্ভব নয়।'

অস্বস্তির একটা ছায়া পড়ল ব্রুনোর চেহারায়, এদিক ওদিক মাথা নাড়তে নাড়তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'আমি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, মিঃ রানা, নষ্ট করার মতো সময় নেই। কিছু যদি মনে না কে ন, আপনি এখন···'

চেয়ার ছেড়ে ওঠার কোনো লক্ষণ নেই রানার মধ্যে। ব্রুনোকে বাধা দিয়ে বলল, 'বসুন।' অনুরোধ নয়, কঠোর আদেশের মতো শোনাল ওর কণ্ঠস্বর।

রানার চোখের দিকে তাকিয়ে থমকে স্থির হয়ে গেল ব্রুনো। উজ্জ্বল কোনো পাথরের দুটো টুকরো যেন। কয়েক সেকেণ্ড নড়ল না সে। ইতস্তত করছে। রানার কথা অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েও শেষ মুহূর্তে কি ভেবে যেন কাঁধ ঝাঁকাল, নিঃশব্দে বসে পড়ল আবার চেয়ারে।

চিবুক নেড়ে টেলিফোনটা দেখালো তাকে রানা। 'জেনারেল

কেলনার ফিল্ডকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিন।'

'জেনারেল ফিল্ড?' ভুর জোড়া কুঁচকে উঠল ব্রুনোর। 'ফরেন আর্মস শিপমেণ্টের চীফ ইন্সপেক্টর? আপনি তাঁর কাছ থেকে এসেছেন?'

ইঙ্গিতে টেলিফোনটা আরেকবার দেখাল ব্রুনোকে রানা।

'কিন্তু জেনারেলকে ফোন করার আগে তাঁর সাথে আপনার সম্পর্কটা কি জানতে চাই আমি।'

'যা বলছি করুন,' বলল রানা। 'সবই জানতে পারবেন।'

'এর মধ্যে হুমকির সুর লক্ষ্য করছি আমি, মিঃ রানা,' গম্ভীর গলায় বলল ব্রুনো। 'আপনার অনুরোধ রক্ষা করা না হলে আপনি জেনারেল ফিল্ডকে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবেন, এই তো?'

'সামান্য একটা তথ্য জানতে চেয়েছি আমি,' বলল রানা। 'লী রেফারীর কাছ থেকে যে ন্যাভাল শেলগুলো কিনেছেন সে-গুলো এখন কোথায়?' মুচকি একটু হাসল রানা। 'আমার অনুরোধ আপনি রাখছেন না, কিন্তু জেনারেল ফিল্ড যদি আদেশ করেন?'

চেহারাটা লাল হয়ে উঠল ব্রুনোর। 'সেক্ষেত্রে···হুঁ, ঠিক আছে, দেখা যাক।' হাত বাড়িয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল সে।

'এই নিন, জেনারেলের ফোন নাম্বার,' বলল রানা, এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে ধরল ব্রুনোর দিকে।

'দরকার নেই' বলল ব্রুনো। 'জেনারেলের সব ক'টা ফোন

নাম্বার আমার জানা আছে।' ডায়াল করছে সে। 'কিন্তু এখন কি পাওয়া যাবে জেনারেলকে? লাঞ্চ খেতে বেরিয়ে গেছেন কিনা...'

'জেনারেল তাঁর ডেস্কে বসেই লাঞ্চ সারেন।'

এবার নিয়ে তিনবার বাজছে ফোনের বেল। ট্রাউজারের গায়ে হাতের তালুর ঘাম মুছে নিয়ে রিসিভারটা তুলল কর্ণেল রেজনিক। কথা বলার আগে বাঁ হাতে ধরা সাগর কলায় মস্ত একটা কামড় দিয়ে নিল। 'জেনারেল কেলনার ফিল্ড বলছি।'

'জেনারেল, ইউনিভার্সেল আর্মস থেকে টার্নার ব্রুনো বলছি...

'খাবার সময়ও শান্তি দেবে না তোমরা আমাকে? যা বলতে চাও, তাড়াতাড়ি বলো। গলার আওয়াজটা অমন ভোঁতা শোনাচ্ছে কেন তোমার?'

'জেনারেল, আপনার গলাও কেমন যেন...

'খাচ্ছি, তাই,' বলল রেজনিক। 'মতলবটা কি বলে ফেলো তাড়াতাড়ি।'

'অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত, জেনা-রেল,' অপরপ্রান্ত থেকে বলছে ব্রুনো। 'মিঃ মাসুদ রানা নামে কাউকে চেনেন আপনি?'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর রেজনিক বলল, 'রানা? মাসুদ রানা? খুব চিনি। কেন, তার ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছ কেন? তোমার মতো ব্যবসায়ীদের শায়েস্তা করার উপযুক্ত লোক সে, সন্দেহ নেই। সিনেট আর্মড ফোর্স কমিটির একজন

ইনভেস্টিগেটর সে।' একটু থেমে রেজনিক আবার জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার, ব্রুনো?'

'ওনার তাহলে ক্ষমতা আছে…?'

'ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারে? কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমার চেয়ে বেশি।'

'আমার সামনে বসে রয়েছেন উনি,' বলল ব্রুনো। 'স্টক, বেচাকেনার রেকর্ড ইত্যাদি দেখতে চাইছেন।'

'নার্ভ-গ্যাস উইপন কোথায় কি আছে তার খোঁজ বের করাই ওর কাজ,' সাগর কলায় আরেকটা কামড় দিয়ে বলল রেজনিক। দেরাজ খুলে তার ভেতর কলার খোসাটা রাখল। 'তোমার কাছে যদি কোনো গ্যাস ক্যান থাকে, ওকে জানাও। তা নাহলে বিপদে পড়বে। ওকে ভয় পাবার কিছু নেই, ও শুধু তথ্যগুলো চায়। কিন্তু ভুল তথ্য দিয়ে যদি ধরা পড়ো, তোমার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে ওই লোক। সাবধান।'

'ধন্যবাদ, জেনারেল, অসংখ্য ধন্যবাদ,' অপরপ্রান্ত থেকে কৃতজ্ঞ চিত্তে বলল ব্রুনো। 'আপনার পরামর্শ না পেলে আমি বোধহয় ভুলই করে ফেলছিলাম।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে স্বস্তির গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলল রেজনিক। রুমাল বের করে রিসিভারটা মুছল সে, তারপর ধীর পায়ে বেরিয়ে এলো হলরুমে। জেনারেলের অফিসের দরজা বন্ধ করছে, এই সময় করিডোরে দেখা গেল সবুজ ইউনিফর্ম পরা একজন ক্যাপ্টেনকে। কর্ণেলকে দেখে সন্দেহের ছায়া পড়ল ক্যাপ্টেনের চেহারায়।

'এক্সকিউজ মি, কর্ণেল,' দাঁড়িয়ে পড়েছে ক্যাপ্টেন। 'আপনি কি জেনারেলের সাথে দেখা করতে চান? কিন্তু তিনি তো লাঞ্চ খেতে বাইরে গেছেন।'

তীব্র দৃষ্টি হানল কর্ণেল, ক্যাপ্টেনের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, 'জেনারেলকে আমি চিনি না। কংক্রিটের এই জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমি অ্যাক্সিডেণ্ট অ্যাণ্ড সেফটি ডিপার্ট-মেণ্ট খুঁজছি আমি।'

সন্দেহ এবং অস্বস্তি থেকে মুক্ত হয়ে মৃদু একটু হাসল ক্যাপ-টেন। 'আর বলবেন না, কর্ণেল। আমি নিজেই দিনের মধ্যে কম করেও দশবার পথ হারিয়ে ফেলি। এর নিচের তালায় নামতে হবে আপনাকে। ডান দিকে এগিয়ে বাঁক নিলেই এলিভেটরটা দেখতে পাবেন।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন।'

'মাই প্লেজার, স্যার।'

এলিভেটরের ভেতর ঢুকে রেজনিক ভাবছে, দেরাজ খুলে কলার খোসাটা যখন পাবেন জেনারেল, কি ভাববেন তিনি?

ইউনিভার্সেল আর্মস কর্পোরেশনের অয়্যারহাউস। নীল ইউনিফর্ম পরা চারজন গার্ড দাঁড়িয়ে আছে গেটের দু'পাশে। প্রত্যেকের কাঁধের সাথে ঝুলছে অত্যাধুনিক অ্যাসল্ট রাইফেল।

রোলস-রয়েস থামিয়ে স্টিয়ারিং হুইল থেকে দুটো হাতই মুহূর্তের জন্যে ওপরে তুলে ফেলল ব্রুনো, ভঙ্গিটা যেন গার্ডদের প্রতি সস্নেহ আদরের প্রকাশ। প্রকাণ্ডদেহী গার্ডদের নেতা

একবার শুধু ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকাল। সেটা লক্ষ্য করে একজন গার্ড এগিয়ে গিয়ে খুলে দিল গেট।

'ওটা বোধহয় সিগন্যাল?'

'মাপ করবেন, আপনার প্রশ্নটা ঠিক...' রানার দিকে তাকিয়ে শুরু করল ব্রুনো।

'স্টিয়ারিং হুইল থেকে হাত তুললেন।'

'হ্যাঁ,' মুখের চেহারা কালো হয়ে গেছে ব্রুনোর। 'সিগন্যাল। আপনার হাতে আড়াল করা একটা রিভলভার থাকলে হাত দুটো হুইল থেকে তুলতাম না। আপনার দৃষ্টি থাকতো গেটের দিকে, আর যে গেট খুলছে সেই গার্ডের দিকে। ওই ফাঁকে ওদের একজন চুপিসাড়ে গাড়ির পিছন দিকে সরে এসে ফুটো করে দিতো আপনার খুলি।'

'হাত তুলতে ভুল করেননি, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি।'

'আপনার নজর বড় চোখা, মিঃ রানা,' গম্ভীর গলায় বলল ব্রুনো। 'গেট গার্ডদের জন্যে নতুন সিগন্যালের ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে।' গাড়ি ছেড়ে দিল সে, গেট পেরিয়ে সরু কংক্রিটের রাস্তা ধরে ছুটছে রোলস-রয়েস। রাস্তার দু'পাশে প্রকাণ্ড টিন-শেডের সারি, প্রায় মাইল খানেক লম্বা। এরপর ফাঁকা মাঠ, মাঠ জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভাঙা, আধা-ভাঙা বিভিন্ন আকারের আর্মার ট্যাংক। ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে কাজ করছে মেকানিকরা।

'কতো একর নিয়ে আপনার এই অয়্যারহাউস?' জানতে

চাইল রানা।

'পাঁচ হাজার,' বলল ব্রুনো। 'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ছয়টা অস্ত্র সমাবেশের একটা দেখছেন আপনি। এয়ারফোর্স ইকুইপমেন্টের হিসাবে সপ্তম স্থান অধিকার করে আছি আমরা।'

কংক্রিটের রাস্তা ছেড়ে একটা মেটো পথে নেমে এলো রোলস-রয়েস। পাহাড়ের ধারে বড় বড় টিন-শেড, গুহার ভেতরও অস্ত্র রাখার জন্যে জায়গা করে নেয়া হয়েছে। "আর-সেনাল সিক্স" লেখা একটা টিন-শেডের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল ব্রুনো। নিচে নেমে পকেট থেকে একটা চাবি বের করল, প্রকাণ্ড তালায় ঢুকিয়ে ঘোরাতেই খুলে গেল সেটা। ইস্পাতের পাত মোড়া কবাট দুটো উন্মুক্ত করে দেয়াল হাতড়ে সুইচ অন করল সে। 'আসুন।'

ভেতরে ঢুকে টিন-শেডের আকার দেখে বিস্মিত হলো রানা। ঢাকা স্টেডিয়ামের অর্ধেক তো বটেই, তার চেয়ে বেশি হওয়াও বিচিত্র নয়। হাজার হাজার অ্যামুনিশনের বাক্স একটার ওপর আরেকটা সাজানো রয়েছে, আরেক ধারে আকারে আরো বড় কাঠের বাক্স দেখা যাচ্ছে, নানা ধরনের শেল আছে ওগুলোয়। সারিগুলোর শেষ প্রান্ত অনেক দূরে, দেখা যায় না। এর আগে এক সাথে এত বেশি মারণাস্ত্র দেখেনি রানা।

হুড খোলা ছোটো একটা রেল গাড়ি দেখাল ব্রুনো, বলল, 'আণ্ডারগ্রাউণ্ডে নামছি না আমরা, কাজেই ওটা ব্যবহার করা যেতে পারে।'

'এর নিচেও অস্ত্রপাতি আছে?'

'আণ্ডারগ্রাউণ্ড গোডাউনটা প্রায় দুই মাইল লম্বা।'

ভেতরটা ঠাণ্ডা। বিদ্যুৎচালিত গাড়িটার মৃদু গুঞ্জন ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। খানিক দূর এগিয়ে একটা সাইড টানেলে ঢুকল গাড়ি। গতি কমিয়ে আনল ব্রুনো। আলোর সামনে একটা ম্যাপের ভাঁজ খুলল সে। 'ষোল ইঞ্চি ন্যাভাল শেল আজকাল ব্যবহার করা হয় না বললেই চলে,' মুখ তুলে বলল সে। 'পাওয়াও যায় না কোথাও, কিন্তু আমার কাছে এখনো কিছু আছে। এগুলো কিনে ভাল ব্যবসা করতে পারিনি আমি। এখান থেকে শুরু, শেষ হয়েছে প্রায় একশো গজ দূরে, ষোল ইঞ্চি গ্যাস শেলগুলোও এই সারিগুলোর মধ্যে পাবেন। রেফারীর কাছ থেকে যেগুলো কিনেছিলাম, বাঁ দিকে প্রথম সারির মাঝখানে কোথাও আছে।'

'কিন্তু একটা শেলও ক্যানে মোড়া দেখছি না।'

কাঁধ ঝাঁকাল ব্রুনো। 'ব্যবসা করতে হলে লোকসান দিতে নেই। স্টেন-লেস স্টীল ক্যানের অনেক দাম। ওগুলো আমি একটা কেমিক্যাল কোম্পানীর কাছে বেচে দিয়েছি।'

'কিন্তু এতো শেলের মধ্যে ওগুলো খুঁজে বের করা...'

'মোটেও কঠিন কাজ নয়,' বলল ব্রুনো। 'গ্যাস শেলগুলো লট সিক্স-এ আছে।' গাড়ি থেকে নেমে পা বাড়াল সে। প্রজেক্টাইলের মাঝখান দিয়ে বিশ-পঁচিশ গজের মতো এগিয়ে থামল। পিছনে রানার পায়ের আওয়াজ পেয়ে হাত তুলে একটা সরু গলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'ওই যে, পেয়েছি।' গলির ভেতর ঢুকে কয়েক পা এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল সে। আগের

জায়গায়, মেইন প্যাসেজে দাঁড়িয়ে আছে রানা।

ক্রুনোর মাথার ওপর উজ্জ্বল বালব। তার চেহারাটা বিবর্ণ হয়ে যেতে দেখল রানা। 'কি ব্যাপার ?' দ্রুত জানতে চাইল ও।

চুপ করে থাকল ক্রুনো। মাথা নাড়ছে এদিক ওদিক। তার-পর বলল, 'বুঝতে পারছি না। এখানে মাত্র চারটে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু থাকার কথা আটটা।'

গায়ে কাঁটা দিচ্ছে রানার। স্তব্ধ হয়ে থাকল কয়েক সেকেণ্ড। সমস্ত শরীরের পেশীতে টান পড়েছে 'খুঁজে দেখুন, নিশ্চয়ই কোথাও আছে।'

'প্লীজ, আমাকে একটু সাহায্য করুন, বলল ক্রুনো। 'ওই প্রান্ত থেকে চেক করতে শুরু করুন আপনি, লট থারটি থেকে। আমি লট ওয়ান থেকে শুরু করছি।'

চল্লিশ মিনিট পর মাঝামাঝি জায়গায় আবার ওরা মিলিত হলো। স্তম্ভিত একটা ভাব ফুটে উঠেছে ক্রুনোর চেহারায়।

'নেই !'

'চালাকী করার জায়গা পাননি !' নিজের গলার আওয়াজে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল রানা, চারদিক থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে কথাগুলো। 'নিশ্চয়ই আপনি বিক্রি করে দিয়েছেন ওগুলো।'

'না !' জোরের সাথে প্রতিবাদ জানাল ক্রুনো। 'ওগুলো কিনে ঠকে গিয়েছিলাম আমি। কোনো সরকারই গ্যাস শেল কিনতে চায় না আজকাল...'

'বাকি চারটে তাহলে গেল কোথায় ?' অনেক কষ্টে নিজেকে

সামলে নিয়ে জানতে চাইল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করল ব্রুনো। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, ইনভেনটরি রেকর্ড চেক করে দেখা যাক। বিক্রি যদি করা হয়ে থাকে, তাও জানা যাবে। কিন্তু বিক্রি যে হয়নি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

টানেলের ঢোকার মুখে এসে দাঁড়াল ব্রুনো। হুকে ঝোলানো টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে দ্রুত ডায়াল করল। সতর্ক করে দিল অফিসকে। রানাকে সাথে নিয়ে সে যখন অফিসে গিয়ে পৌঁছুল, কর্পোরেশনের অ্যাকাউন্টেন্ট খাতা-পত্র খুলে অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। দ্রুত লেজারের পাতা উল্টে সাত মিনিটের মধ্যে উত্তর বের করে ফেলল ব্রুনো।

'আমারই ভুল হয়েছে,' মৃদু গলায় বলল সে।

চুপ করে আছে রানা, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে, ধীরে ধীরে বাঁকা হয়ে শক্ত মুঠো হয়ে যাচ্ছে হাতের আঙ্গুল।

'বাকি চারটে গ্যাস শেল বিক্রি হয়ে গেছে।'

এখনও চুপ করে আছে রানা, স্থির চোখের মণিতে খুনের নেশা।

'মারাত্মক একটা ত্রুটি,' ম্লান গলায় বলল ব্রুনো। 'যেখান থেকে নেবার কথা সেখান থেকে না নিয়ে অন্য লট নাম্বার থেকে শেলগুলো তুলে নিয়ে গেছে আরসেনাল কর্মীরা। অরিজিন্যাল শিপিং অর্ডারে বলা হয়েছে, লট সিক্সটিন থেকে চল্লিশটা হেভী ন্যাভাল অর্ডন্যান্স বের করতে হবে, কিন্তু তা না করে ওরা লট

সিক্স থেকে নিয়ে গেছে ওগুলো। এর একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হতে পারে, সিক্সটিনের জায়গায় সিক্স পড়েছে ওরা। তা সম্ভব। ওদের কার্বন কপিতে ওয়ান সংখ্যাটা ওঠেনি, শুধু সিক্স পড়েছে ওরা—নিশ্চয়ই তাই।'

গম্ভীর, থমথমে গলায় জানতে চাইল রানা, 'পারচেজ অর্ডারে কার নাম রয়েছে?'

'ওই একই মাসে তিনটে অর্ডার পাই আমরা…'

'তালিকাটা চাই আমি।'

'কিন্তু, মিঃ রানা,' প্রতিবাদের সুরে বলল ব্রুনো, 'আমার অসুবিধেটা দয়া করে একটু বোঝার চেষ্টা করুন। আমার পার্টিরা যদি জানতে পারে…'

'আপনি চান আপনার বিরুদ্ধে সিনেট কমিটিতে রিপোর্ট করি আমি?' রূঢ় গলায় জানতে চাইল রানা।

'তারচেয়ে আপনি আমাকে গুলি করে মেরে ফেলুন,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ব্রুনো। তারপর সামলে নিল। 'বেশ, ঠিক আছে।' একটা প্যাড টেনে খস খস করে তাতে ক্রেতাদের নাম ঠিকানা লিখল সে। 'কিন্তু আপনার কাছে অনুরোধ রইল, আমার পার্টি-দেরকে যেন ভুগতে না হয়, মিঃ রানা।' প্যাড থেকে কাগজটা ছিঁড়ে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

একটা শেল কিনেছে ব্রিটিশ ইমপিরিয়াল ওয়র মিউজিয়াম, লণ্ডন। দুটো নিয়ে গেছে ফরেন ওয়রস্, ডেটন সিটি পোস্ট নাইন-নাইন-সেভেন-ফোর, ওকলাহোমা-র একদল বুড়ো সৈনিক। বাকি সাঁইত্রিশটা একজন বিদেশী এজেন্টের মাধ্যমে কিনেছে এ.

এ. আর.—আফ্রিকান আর্মী অব রেভোলিউশন। কোনো ঠিকানা দেয়া হয়নি।

কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ভরল রানা, উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। 'এখানে যে চারটে শেল রয়েছে ওগুলো নিয়ে যাবার জন্যে লোক পাঠাব আমি,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ও। ব্রুনো কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে তার মুখের সামনে হাতের ঝাপটা মারল। 'কোনো কথা নয়! আমার লোক এলে শেলগুলো দিয়ে দেবেন।'

'কিন্তু...' শুরু করল ব্রুনো।

'আপনি জানেন, ওর একটা যদি ফাটানো হয়, তার পরিণতি কি হবে?' ব্রুনোর নাকের ওপর দুম করে একটা ঘুষি বসিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে রানার, কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে সে। 'লাখ লাখ, এমন কি কোটি কোটি লোকও মারা যেতে পারে। এবং সেজন্যে, যতো সামান্যই হোক, আপনিও দায়ী হবেন।'

এই প্রথম দাঁত বের করে হাসল টার্নার ব্রুনো। 'লাখ বা কোটি, ওসব আমার কাছে নিষ্প্রাণ সংখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়, মিঃ রানা। একজন ব্যবসায়ী শুধু তার লাভ-লোকসানই বোঝে। আর কোনো ব্যাপারে মাথা ঘামাবার কি দায় পড়েছে তার?'

টেক্সাস। শেপার্ড এয়ার ফোর্স বেসের এয়ারস্ট্রিপ। স্পুক এফ-ওয়ান-ফোর-জিরো নিয়ে নামল কর্ণেল রেজনিক। ফ্লাইট অপারেশন অফিসারের সাথে কথাবার্তা শেষ করে বেসের মটর

পুল থেকে একটা গাড়ি ধার করল সে। ষাট মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে উত্তর দিকে আসছে। রেড রিভার পেরিয়ে প্রবেশ করল ওকলাহোমায়। তারপর বাঁক নিয়ে স্টেট হাইওয়ে ফিফটি-থ্রি-তে উঠে এলো। তিনটে বাজে, কিন্তু রাস্তায় না আছে একটা গাড়ি, না আছে একটা লোক। রাস্তার দু'পাশে খাঁ খাঁ করছে গমের ক্ষেত। ফসল কাটা হয়ে গেছে, যতোদূর চোখ যায় শুধু ফাঁকা মাঠ, সীমাহীন নির্জনতা। আধ ঘণ্টা পর ছোটো একটা শহরে ঢুকল রেজনিক। চৌরাস্তায় কয়েকটা সাইনবোর্ড দেখে বুঝল ডেটন সিটিতে পৌঁছে গেছে সে। একটা মণিহারী দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, 'ভেটেরান ফরেন ওয়র পোস্ট নাইনটি-নাইন সেভেনটি ফোর কোন্ দিকে বলতে পারেন?'

'সোজা ডান দিকে চলে যান, তারপর আবার বাঁক নিয়ে দক্ষিণ দিকে খানিক দূর গেলেই সাইনবোর্ডটা দেখতে পাবেন।'

সাইনবোর্ডটা ছাড়িয়ে একটা কাঁকর বিছানো রাস্তায় নেমে এলো রেজনিক, গাড়ি থামাল প্রকাণ্ড একটা দোতালা বাড়ির সামনে। নিচে নেমে একটা সিগারেট ধরাল সে, সামনের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে দেখল বিরাট একটা হলরুম, টেবিলে বসে খাওয়াদাওয়া করছে লোকজন। খানিক ইতস্ততঃ করে ভেতরে ঢুকল সে। একটা টেবিল থেকে তিনজন লোক লক্ষ্য করল তাকে, তাদের মধ্যে থেকে বিশালদেহী একজন হাত নাড়ল তার উদ্দেশ্য। এগিয়ে গেল রেজনিক।

'গুড আফটারনুন, কর্ণেল,' হাসিমুখে বলল লোকটা।

'আপনি কাউকে খুঁজছেন ?'

'হ্যাঁ,' বলল রেজনিক। 'পোস্ট কমাণ্ডার, মিঃ গেভিনকে দরকার আমার।'

'আমিই তো। বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি ?'

'হাউ ডু ইউ ডু,' নরম গলায় বলল রেজনিক। 'আমি রেজনিক, অ্যাবি রেজনিক। জরুরী একটা ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলার জন্যে ওয়াশিংটন থেকে এসেছি।'

'নিশ্চয়ই টপ-সিক্রেট কোনো রাশান স্পাই স্যাটেলাইট আমাদের কাছে পিঠে কোথাও নেমেছে ?' হালকা কৌতুকের সুরে বলল পোস্ট কমাণ্ডার।

হাসল না রেজনিক। 'দুটো ন্যাভাল শেলের খোঁজে এসেছি আমি,' মৃদু গলায় বলল সে। 'ইউনিভার্সেল আর্মস করপোরেশনের কাছ থেকে কিনেছেন আপনারা।'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে,' বলল পোস্ট কমাণ্ডার গেভিন। 'নষ্ট শেল দুটোর কথা বলছেন আপনি।'

'নষ্ট ?'

'ভেটেরানদের পিকনিক উপলক্ষে ফাটাতে চেয়েছিলাম ওগুলো। একটা ট্রাক্টরে সেট করে সারাটা বিকেল আমরা চেষ্টা করি, কিন্তু ফাটাতে পারিনি। পরে ইউনিভার্সেল আর্মসকে ফোন করে ব্যাপারটা তাদেরকে জানাই, কিন্তু শেলগুলো বদলে দিতে রাজি হয়নি তারা।'

উত্তেজনা চেপে রেখেছে রেজনিক। হাতের তালু ঘামছে তার। 'ওগুলো হয়ত সেলফ-ডিটোনেটিং ধরনের অর্ডন্যান্স নয়।'

'উঁহু,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে পোস্ট কমাণ্ডার। 'ওরা গ্যারান্টি দিয়ে বলেছিল, জ্যান্ত ব্যাটলশিপ শেল ওগুলো।'

'তারপর?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল রেজনিক।

'তারপর মানে?'

'কোথায় সেগুলো? ফেলে দিয়েছেন?'

'না। আছে। ওগুলোর মাঝখান দিয়েই তো হেঁটে এসেছেন আপনি,' বলল পোস্ট কমাণ্ডার। রেজনিককে সাথে নিয়ে বাইরে এলো সে।

পোস্টে ঢোকার মুখে দু'পাশে দুটো শেল লম্বা করে ফেলে রাখা হয়েছে। আসল চেহারা হারিয়ে গেছে সাদা রঙের নিচে। দুটোর গায়েই ঝালাই করে আঙটা বসানো হয়েছে, আঙটা দুটোর সাথে একটা চেইন বাঁধা রয়েছে, পথের ওপর একটা ফিতের মতো ঝুলছে সেটা।

উত্তেজনায় কথা বলতে পারছে না রেজনিক। সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে আছে শেল দুটোর দিকে। ডগাগুলো গোলাকার। গ্যাস শেল। যে চারটে খুঁজছে ওরা, তারই দুটো এগুলো। হঠাৎ পা দুটো অসাড় হয়ে গেল রেজনিকের, ধীরে ধীরে সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ল সে। চোখের সামনেটা ঝাপসা লাগছে। ভুরু-কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে আছে পোস্ট কমাণ্ডার।

'এনিথিং রঙ, কর্নেল?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইল সে।

'এগুলোর গায়ে গুলি করেছেন আপনারা?' রেজনিকের গলায় অবিশ্বাস।

'প্রায় একশো রাউণ্ড। মাথার দিকে খানিকটা ছাল ওঠাতে

পেরেছিলাম শুধু, ব্যাস।' তীক্ষ্ণ হলো গেভিনের দৃষ্টি। 'কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো ?'

'এক্সপ্লোসিভ নয়,' ধীরে ধীরে বলল রেজনিক, 'ওগুলো গ্যাস শেল। প্যারাস্যুট উন্মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ওগুলোর ফায়ারিং মেকানিজম সেলফ-অ্যাকটিভেট হবে না। আপনাদের বুলেটে কো'না কাজ হয়নি, তার কারণ অন্যান্য সাধারণ এক্সপ্লোসিভ প্রজেক্টাইলের মতো ডিটোনেটের জন্যে এর মেকানিজম আগে থেকেই সেট করা নেই।'

'আমার মাথা ঘুরছে, কর্ণেল!' কপালে উঠে গেছে পোস্ট কমাণ্ডারের চোখ। 'আপনি বলতে চাইছেন, ওগুলোর ভেতর পয়জন গ্যাস আছে ?'

ওপর-নিচে শুধু মাথা দোলাল রেজনিক।

'ইয়াল্লা! ইয়াল্লা! তার মানে হাজার হাজার লোকের মৃত্যুর জন্যে দায়ী হতাম আমরা...'

'হয়ত আরো কয়েক হাজার গুণ বেশি,' বিড় বিড় করে বলল রেজনিক। সিঁড়ির ধাপ থেকে উঠে দাঁড়াল সে। 'আপনাদের বাথরুম আর টেলিফোনটা ব্যবহার করব আমি। শেলগুলো এখান থেকে...'

'অবশ্যই। আসুন আমার সাথে। হলের বাঁ দিকে গেলেই দেখতে পাবেন বাথরুম, আর আমার অফিসে ফোন আছে। কিন্তু, কর্ণেল, শেলগুলো যদি আপনাকে নিয়ে যেতে দিই...'

'এগুলোর বদলে আপনার পোস্ট দশটা ষোল-ইঞ্চি শেল যাতে পায় তার ব্যবস্থা আমি করব,' বলল রেজনিক। 'আগামী

পিকনিকে ফাটাবেন ওগুলো। কেমন হবে সেটা?'

'ওয়াণ্ডারফুল!' ছু'কান পর্যন্ত প্রসারিত হলো পোস্ট কমাণ্ডারের হাসি।

বাথরুমে ঢুকে চোখে-মুখে ঠাণ্ডা পানির ছিটে দিচ্ছে রেজনিক। আয়নায় চোখ দুটোকে টকটকে লাল আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে, কিন্তু তবু দৃষ্টিতে ফুটে রয়েছে আশার আলো। চারটের মধ্যে দুটো কুইক-ডেথ ওয়ারহেড উদ্ধার করতে পেরেছে সে। মনে মনে এখন শুধু একটাই প্রার্থনা তার, মিঃ রানার ভাগ্যও যেন তার মতো ভালো হয়।

নুমা হেডকোয়ার্টার। ডিরেক্টর জর্জ হ্যামিলটনের অফিস কামরা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকল অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের পার্সোন্যাল সেক্রেটারী মেরিলিন। খুট করে বোতাম টিপে ডেস্কের আলোটা জ্বালল। রিভলভিং চেয়ারের দিকে তাকাল না, জানে ওখানে কেউ বসে নেই। খানিক আগে চলে গেছেন চীফ। ধীর পায়ে একটা সোফার দিকে এগোচ্ছে মেরিলিন। ডেস্কের আলোটা সরাসরি পড়েনি সোফার ওপর, তবে উজ্জ্বল আভায় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে রানাকে। মাথার পিছনে একটা হাত রেখে ঘুমাচ্ছে, এক দিকে কাত হয়ে আছে মাথাটা, অপর হাতটা ঝুলে পড়েছে মেঝেতে। ঝুঁকে পড়ল মেরিলিন। ঘন কালো চুলের ফ্রেমে অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে মুখটা, চোখের পাতা সামান্য একটু ফাঁক করে দেখতে পাচ্ছে রানা। হঠাৎ যেন ইলেকট্রিক

শক খেয়ে সটান খাড়া হয়ে গেল মেরিলিন। 'মিঃ রানা,' তাড়াতাড়ি বলল সে, 'আপনি জেগে আছেন ?'

'ছিলাম না,' সোফার ওপর উঠে বসল রানা, 'তোমার পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। কি ব্যাপার ?'

'লং ডিস্ট্যান্স টেলিফোন,' বলল মেরিলিন। 'কর্নেল রেজনিক। তিন নম্বর লাইনে।'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল রানা। ডেস্কের সামনে গিয়ে তুলে নিল তিন নম্বর লাইনের রিসিভার। 'কর্নেল ?'

'তুটো ওয়রহেড উদ্ধার করেছি, মিঃ রানা,' চিকন, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর, কিন্তু আনন্দে উত্তেজনায় অধীর। 'ভাবতেও পারিনি এতো সহজে...'

'ভেরি গুড,' বলল রানা, কয়েক দিনের মধ্যে আজ এই প্রথম হাসি দেখা যাচ্ছে ওর মুখে। 'কোনো সমস্যা নেই তো ?'

'নেই। ওগুলো নিয়ে যাবার জন্যে লোকজন না আসা পর্যন্ত এখানেই আছি আমি।'

'নুমার একটা ক্যাটলিন প্লেন দাঁড়িয়ে আছে ডালেস এয়ারপোর্টে, ফর্কলিফট ইত্যাদি সহ রেডি। কোথায় ল্যাণ্ড করবে ওটা ?'

অপর প্রান্তে কার সাথে যেন আলোচনা করে নিল রেজনিক, তারপর বলল, 'শহরের দক্ষিণে ছোটো একটা এয়ারস্ট্রিপ আছে, আটশো গজ লম্বা রানওয়ে—চলবে ?'

'চারশো গজ রানওয়েতেও নামতে পারে ক্যাটলিন।'

'বাকি শেল তুটোর কোনো খবর, মিঃ রানা ?'

'এখনো কিছু জানতে পারিনি,' বলল রানা। 'ব্রিটিশ ইমপেরিয়াল ওয়র মিউজিয়ামের কিউরেটর জানিয়েছেন, ইউনিভার্সেল আর্মসের কাছ থেকে তারা যে ন্যাভাল শেল দুটো কিনেছেন সেগুলো অবশ্যই এক্সপ্লোসিভ শেল, সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই।'

'তার মানে আফ্রিকান আর্মি অব রেভোলিউশনের কাছে রয়েছে বাকি দুটো ওয়র-হেড।'

'না, নেই,' বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন তাঁর গোপন সূত্র থেকে খবর নিয়ে জানতে পেরেছেন আফ্রিকান আর্মি অব রেভোলিউশন সরাসরি বা কোনো এজেন্টের মাধ্যমে কখনো কোথাও থেকে কোনো শেল কেনেনি।'

'হোয়াট!' আঁতকে উঠল রেজনিক। 'তার মানে টার্নার ব্রুনো মিথ্যে তথ্য দিয়েছে আপনাকে?'

'মনে হয় না,' বলল রানা। 'যে কিনেছে সে মিথ্যে পরিচয় দিয়েছে নিজের, অন্ততঃ আমার তাই ধারণা।'

'কেন? ব্যাপারটা গোপন করতে চাওয়ার উদ্দেশ্য? তার আসল পরিচয়?'

'ধীরে, কর্ণেল, ধীরে,' বলল রানা। 'ভয়ংকর আর জটিল একটা সমস্যা, রাতারাতি এর সমাধান বের করা সম্ভব নয়। প্রথম কাজ ওয়র-হেডগুলো কোথায় আছে তা জানা। এ-ব্যাপারে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন তাঁর একজন পুরনো বন্ধুর সাহায্য নিচ্ছেন। ভদ্রলোক ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর হেডকোয়ার্টারে আছেন।'

'কিন্তু এন. এস. এ.-র চীফ ডেভিড মরগান অত্যন্ত খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ,' বলল রেজনিক। 'তিনি যদি কৌতূহলী হয়ে ওঠেন, সব ফাঁস হয়ে যাবে···'

'সে ভয় নেই,' বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন চমৎকার একটা কাভার তৈরি করেছেন, আসল ব্যাপার টের পাবে না কেউ।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, কখন যেন নিঃশব্দে কামরা থেকে বেরিয়ে গেছে মেরিলিন। ধীর পায়ে ফিরে এসে সোফায় বসল ও। একটা সিগারেট ধরিয়ে হেলান দিল, চোখ বুঁজে চিন্তা করছে। লোরার কাকার গ্যারেজে স্ট্রাটোক্রুজারের অক্সিজেন ট্যাংক আর নোজ গিয়ারটা দেখার পর থেকেই কেন যেন খুঁতখুঁত করতে শুরু করে ওর মন। নিজের কাছেই অস্বাভাবিক লেগেছিল ব্যাপারটা। মনের ওই খুঁতখুঁতে ভাবের জন্যেই একটা জেদ চেপে গিয়েছিল, এর শেষ দেখার জন্যে একটা তাগাদা অনুভব করেছিল ও। মন খুঁতখুঁত করার কারণটা কি, এখনও তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে না ও, কিন্তু বিশ দিন আগের এক সকালের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। সেদিন ওকে যা বলেছিলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান, তার সাথে বোধহয় একটা যোগাযোগ আছে এই ব্যাপারটার ··সমস্ত কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর···

বিশ দিন আগের কথা।

ঢাকা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। হেডকোয়ার্টার। সকাল দশটা। রানার অফিস কামরা।

অনেকদিন পর আবার ওরা নিজেদের মধ্যে পেয়েছে রানাকে। যে যার কাজ ফেলে চলে এসেছে আড্ডা মারতে। চাঁদা তুলে ঝাল-মুড়ির আয়োজন করেছে সোহানা। কোকাকোলার খরচ যোগাচ্ছে রূপা। আর বিনা অনুমতিতে রানার প্যাকেট থেকে একের পর এক সিগারেট খাচ্ছে সোহেল, জাহেদ।

নিজের রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে রানা। ডেস্কের দুই কোণে বসে আছে সোহেল আর জাহেদ। সোহানা দাঁড়িয়ে—ঝাল-মুড়ি পরিবেশন করছে সে। আর ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে কোকাকোলার ছিপি খুলছে রূপা।

'উঁহুঁ, শুধু সিগারেট জরিমানা করে ওর শিক্ষা হবে না,' সোহেলকে উদ্দেশ্য করে বলছে জাহেদ। 'যে অন্যায় করেছে ও, আরো অনেক কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত ওর।'

'আহ, অন্যায়টা কি করলাম, বলবি তো?' জানতে চাইল রানা।

'চোপ্!' চাপা গলায় গর্জে উঠল জাহেদ। 'চোপ্ শালা! তুই এখন আসামী, আমরা তোর বিচার করছি…'

'কিন্তু এখানে ভদ্রমহিলারা রয়েছে, ভাষাটা একটু…'

'এই রানা, খবরদার,' প্রতিবাদের সুরে সতর্ক করে দিল রূপা, 'ফের যদি মহিলা বলো তো অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। কেউ মহিলা বললেই কেন যেন আমার মনে হয়, দু'ছেলের মা হয়ে গেছি আমি।'

'ঠিক বলেছিস,' সায় দিল সোহানা।

'তোমরাও তাহলে আমার বিরুদ্ধে ?' হতাশ গলায় বলল রানা।

'অবশ্যই,' বলল সোহেল। 'তোর বিরুদ্ধে আমাদের কাছে ওরাই তো বিচার দিয়েছে।'

'কিসের অভিযোগে ?'

'ভদ্রতার অলিখিত চুক্তি হলো, অফিসে এসে সবার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা, ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করা,' বলল জাহেদ। 'কিন্তু তুই প্রায় মাস তিনেক অফিস ফাঁকি দিয়ে কাল দুপুর বেলা চোরের মতো চুপি চুপি এসে বিড়ালের মতো নিঃশব্দে পালিয়ে গেছিস।'

'শুধু তাই নয়,' বলল জাহেদ, 'একটা ছুটির দরখাস্ত দিয়ে সাথে সাথে সেটা মঞ্জুরও করিয়ে নিয়ে গেছিস। ছুটি পেলে যে সবাইকে মিষ্টি খাওয়াতে হয়, সেই আইনের কথাটা বুঝি মনে ছিল না ?'

'ছুটি পেলে মিষ্টি খাওয়াতে হয় ? কেন ? কবে থেকে চালু হলো এই আইন ? কে চালু করল ?'

'আমরা,' রায় ঘোষণার সুরে বলল জাহেদ।

'কেউ যদি আইনটা ভাঙার চেষ্টা করে, সেজন্যে কি যেন শাস্তির ব্যবস্থা আছে, জাহেদ ?' নিরীহ ভঙ্গিতে জানতে চাইল রূপা।

'আইন হলো মাথা পিছু দশ টাকা করে মিষ্টি খাওয়াতে হবে,' বলল সোহানা। 'কিন্তু কেউ যদি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা

করে, তার শাস্তি, যে যতো খেতে পারে তাকে ততো মিষ্টি খাওয়াতে হবে।'

'এবং এই আইন বা শাস্তির ব্যাপারে কোনো আপত্তি তোলা যাবে না,' জানাল জাহেদ। 'কেউ যদি এর বিরুদ্ধে একটা কথাও বলে, শাস্তির মাত্রা বেড়ে যাবে।'

'সেটা যেন কি?'

'সবাইকে চাইনীজ খাওয়াতে হবে।' একগাল হেসে বলল জাহেদ।

রানার সামনে হাত পাতল সোহানা, 'বের করো টাকা।'

'তিনশো দিলেই চলবে,' মন্তব্য করল সোহেল।

'যদি না দিই?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

সোহেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জাহেদ বলল, 'নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছে, তাই না? এখন আর পেট ভরা মিষ্টিতেও হবে না। চাইনীজ!' মুখ নেড়ে এমন ভঙ্গি করল, জিভে যেন পানি এসে গেছে তার।

'বেচারা,' বলল রূপা। 'আপীল করারও সুযোগ নেই!'

ডেস্ক থেকে প্যাকেটটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেট বের করল রানা। ধরাল। 'আর যদি চাইনীজ খাওয়াতেও অস্বীকার করি আমি?'

'অমন বোকামি কেউ করে বলে মনে হয় তোর?' সোহেলকে জিজ্ঞেস করল জাহেদ।

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সোহেল। তাকাল রানার দিকে। 'চাইনীজ খাওয়াতে অস্বীকার করলে, সে যদি অবিবাহিত হয়,

কোথাও থেকে একটা মেয়ে যোগাড় করে তার সাথে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। বিয়ে মানেই খানাপিনা, বুঝতেই পারছিস? আর বিবাহিত হলে,···তা জেনে দরকার নেই তোর।'

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রানার চেহারা। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'যাক বাঁচলাম। তোদের কৃপায় তবু আমার একটা বিয়ে হবে। বেশ, তাই দে। বিয়েই করব আমি।'

'অঁ্যা? বিয়ে করবি? চাইনীজ খাওয়াবার ভয়ে?' বিস্ময় বাঁধ মানছে না জাহেদের।

'এতো কথা কিসের?' গম্ভীর স্বরে বলল রানা। 'তোদের বিচার তো মেনেই নিলাম। নিয়ে আয় মেয়ে। বিয়ে করা।'

ওরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

'ফাঁকি দেবার ভালো বুদ্ধি বের করেছে তো শালা,' ফিসফিস করে বলল জাহেদ।

ওদিকে একটু দূরে সরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় শলা-পরামর্শ করছে রূপা আর সোহানা। একটু পরই নতুন বুদ্ধি নিয়ে এগিয়ে এলো রূপা। 'মেয়ে ঠিক হয়েছে। মৌলভী সাহেব-কে ডেকে নিয়ে আসতে পারো এখন।'

খুক্ করে কাশল রানা। 'মেয়েটা···মানে বলছিলাম কি, মেয়েটাকে যদি এক নজর দেখতে পেতাম···

'মেয়ে খুব সুন্দরী, রাশভারী ভঙ্গিতে বলল রূপা, 'দেখার কোনো দরকার নেই।'

'তবু···হে হে···'

এগিয়ে এলো রূপা। হাত বাড়িয়ে রানার স্যুটের পকেট

থেকে সাদা রুমালটা বের করে দ্রুত হাতে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে একটা পুতুল তৈরি করে ফেলল সে। সেটাকে রানার সামনে ডেস্কের ওপর বসিয়ে দিয়ে বলল, 'এতোই যখন দেখার শখ, এই নাও, মনের সাধ মিটিয়ে দেখো।'

হাসির বোমা পড়ল কামরার ভেতর। অনেক দিন এভাবে প্রাণ খুলে হাসেনি ওরা। সবার সাথে হাসছে রানাও।

এই সময় ডাক পড়ল। মেজর জেনারেল রাহাত খানের চেম্বারে।

চোরের মতো নিঃশব্দে চীফের কামরায় ঢুকল রানা। দুরু দুরু করছে বুক। হাতের তালু ঘামছে। ভয়টা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে ইলোরা, চীফ নাকি কি একটা ব্যাপারে তাকে সাবধান করে দেবার জন্যে ডেকেছেন।

'এসো,' ফাইল দেখছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান, মুখ না তুলেই গম্ভীর গলায় বললেন তিনি।

ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। তর্জনীর ইশারায় বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

কেন ডেকেছেন, কিছুই জানে না। কাল থেকে ছুটি, আজ হঠাৎ ডেকে পাঠাবার মতো কি ঘটল?

শুধু দেয়াল ঘড়িটা টিক টিক করছে, আর কোন শব্দ নেই। একটানা অনেকক্ষণ থেকে কানের নিচেটা চুলকাচ্ছে, এবার নিয়ে দু'বার হাত তুলল রানা, কড়ে আঙ্গুল দিয়ে জায়গাটা চুলকে

নিয়ে হাতটা নামাতে যাবে, এই সময় ওকে চমকে দিয়ে রাহাত খান জানতে চাইলেন, 'এলার্জি আছে নাকি তোমার ?'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার, তাড়াতাড়ি বলল, 'না তো, স্যার।'

চুরুট ধরাচ্ছেন রাহাত খান। 'ফাইলে তোমার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কমপ্লেন দেখছি,' অসন্তুষ্ট গলায় বললেন তিনি। 'গত তিন মাসে দু'বার সর্দি হয়েছে তোমার!'

এইজন্যেই ডেকেছেন নাকি? আশংকায় কাঁপছে বুক। আগের কথা মনে পড়ে গেল রানার। লম্বা ছুটি দিয়ে বি. সি. আই. থেকে সরিয়ে দেবার কোনো প্ল্যান করেনি তো বুড়ো? কিছু বলার মতো খুঁজে পাচ্ছে না, বোকার মতো বসে ঘামছে।

গল গল করে নীলচে ধোঁয়া ছাড়ছেন চীফ। 'স্বাস্থ্যের দিকে নজর দাও,' কাঁচা-পাকা ভুরুর নিচে অন্তর্ভেদী চোখ জোড়া রানার মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। 'বি. সি. আই-এর ওটা একটা শর্ত, চাকরী করতে হলে শরীরটাকে সুস্থ রাখতে হবে।' একটু বিরতি নিয়ে আবার বললেন, 'খুব বেশি রাত জাগো বুঝি ?'

'না তো, স্যার,' শেখানো বুলির মতো আওড়াল রানা।

'ছুটি থেকে ফিরে এসে মেডিকেল বোর্ডকে দিয়ে শরীরটা একবার চেক করিয়ে নিয়ো।'

'জ্বী, আচ্ছা, স্যার,' ঢোক গিলে তাড়াতাড়ি বলল রানা।

'ছুটিতে ওয়াশিংটন যাচ্ছ, নাকি সিদ্ধান্ত বদলেছো আবার ?'

'ওয়াশিংটনেই যাচ্ছি, স্যার।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকলেন রাহাত খান, তারপর রানার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'ছুটির মধ্যে কাজের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ো, তা আমার পছন্দ নয়। অনাবিল আনন্দ আর বিশ্রাম, তাকেই বলে ছুটি।'

ধাঁধার মতো লাগছে চীফের কথাগুলো, উদ্দেশ্যটা এখনো ধরতে পারছে না রানা। কিন্তু ডেকে যখন পাঠিয়েছেন, উদ্দেশ্য একটা নিশ্চয়ই আছে। কি সেটা।

'কবীর চৌধুরীর কোনো খবর পেয়েছ আর?' দুম করে প্রশ্ন করে বসলেন রাহাত খান।

'না, স্যার,' বলল রানা। দ্রুত চিন্তা করছে ও। 'আইস-ল্যাণ্ডের পর তার আর কোনো খবর জানা নেই আমার। সি. আই-এ তার তিনটে ল্যাবরেটরী পুড়িয়ে দিয়েছে, ধকলটা বোধ হয় এখনো সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।'

'ভুল করেছে ওরা,' গম্ভীর গলায় বললেন রাহাত খান। 'অতোটা বাড়াবাড়ি করা উচিত হয়নি ওদের। দশ বিলিয়ন ডলারের চেকটা আটকে দিয়েছিল, সেটাই যথেষ্ট ছিল, ল্যাবরে-টরীগুলো পুড়িয়ে দিয়ে তাকে ওরা ক্ষেপিয়ে তুলেছে।'

আগ্রহে চকচক করছে রানার চোখ। 'আপনি তার কোনো খবর পেয়েছেন, স্যার?'

'তোমাকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছে সে,' বললেন রাহাত খান। কপালে চিন্তার রেখা।

'মেসেজ?'

'বরাবর যা করে থাকে, তোমাকে দেখে নেবে বলে হুমকি

দিয়েছে সে,' বললেন মেজর জেনারেল। 'খারাপ কোনো মতলব আছে তার, রানা। তার চালচলন আমার ভালো ঠেকছে না।'

অধীর আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছে রানা।

'শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানি কবীর চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে ছিল।' দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছেন চুরুটটা। ধীরে ধীরে হেলান দিলেন চেয়ারে। 'পুরনো অস্ত্র আর গোলাবারুদ কিনছে সে। কেন, তা জানা যায়নি। অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের নাম-ঠিকানাও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অনেক রাজ্যে ছড়িয়ে আছে তার এজেন্টরা, তারাই এসব কেনাকাটা করছে। তারা নাকি একটা জাহাজ সংগ্রহেরও চেষ্টায় আছে। কি মনে হয় তোমার, রানা?'

চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে রানার কপালে। 'লক্ষণ ভালো বলে মনে হচ্ছে না, স্যার,' বলল ও। 'কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র কিনছে, জাহাজ যোগাড় করার চেষ্টা করছে—অতো টাকা সে পেল কোথায়?'

'মার্কিনীদের ওপর ক্ষেপে গেছে সে। প্রতিশোধ নেবার জন্যে দরকার হলে মার্কিনীদের যারা শত্রু ভাবে তাদের সাহায্য নেবে সে। সাহায্য করতে এক পা এগিয়ে আছে এমন পার্টির তো অভাব নেই। জানতে পেরেছি কে. জি বি-র এজেন্টদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে তার।

'নিশ্চয়ই কোনো প্ল্যান আছে তার, স্যার।'

'হ্যাঁ,' বললেন রাহাত খান। 'ওখানেই যখন যাচ্ছ, চোখ কান একটু খোলা রেখো। এই কথা বলার জন্যেই তোমাকে

ডেকেছিলাম।' খোলা ফাইলে চোখ নামালেন তিনি। তার মানে, বিদায়।

উঠে দাঁড়াল রানা। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো চীফের কামরা থেকে।

তিন

ওয়াশিংটন।

ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর হেডকোয়ার্টার। কাফেটেরিয়া। রোজকার মতো কোণের টেবিলে বসে লাঞ্চ খাচ্ছেন চীফ ডেভিড মরগান। পায়ের আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকালেন তিনি, দেখলেন এজেন্সীর ডোমেস্টিক ডিভিশনের হেড স্যাণ্ডেকার সোজা তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। 'কি হে, এই অসময়ে কি মনে করে?' মরগান জানেন, বাড়িতে ছাড়া অন্য কোথাও লাঞ্চ করে না স্যাণ্ডেকার। ইশারায় একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন তিনি। 'বসো।'

টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল স্যাণ্ডেকার। বসল না। 'ধন্যবাদ, চীফ। সবাইকে নিয়ে মিটিঙে বসতে হবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে।' একটা সিগারেট ধরাল সে। 'এইমাত্র বারবারার সাথে কথা হলো, আপনি নাকি ব্যাটলশিপের ব্যাপারে খোঁজ-খবর করছেন, স্যার?'

মুখ তুলে তাকালেন মরগান। ধীরে ধীরে আপেল পাই চিবাচ্ছেন। 'হ্যাঁ। কেন বলো তো?'

'আমার এক পুরনো বন্ধু, জর্জ হ্যামিলটন···'

স্যাণ্ডেকার একজন অবসরপ্রাপ্ত কমোডোর।

'নুমার ডিরেক্টর, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন?' বাধা দিয়ে জানতে চাইলেন মরগান।

'হ্যাঁ। একটা অনুরোধ করেছেন আমাকে তিনি। পুরনো কিছু ষোল ইঞ্চি ন্যাভাল শেল দরকার তাঁর, খোঁজ নিতে বলেছেন। আমি ভাবলাম···'

'আমার কথা মনে পড়ার কারণ?'

ষোল ইঞ্চি ন্যাভাল শেল তো আর আজকাল তেমন ব্যবহার করা হয় না,' বলল স্যাণ্ডেকার। 'যতদুর জানি, শুধু কোনো কোনো ব্যাটলশিপে এখনও হয়ত ব্যবহার করা হয়। আপনি ব্যাটলশিপ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন শুনে···'

'ষোল ইঞ্চি ন্যাভাল শেল,' অন্যমনস্কভাবে বললেন মরগান। 'কি দরকার ওগুলো অ্যাডমিরালের?'

'বললেন, তাঁর বিজ্ঞানীরা প্যাসিফিক কোরাল ফরমেশনের ওপর ফেলবে।'

চিবানো বন্ধ করে স্যাণ্ডেকারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন মরগান। 'কি?'

'সিসমোলজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। আর্মার-ভেদী শেল দু'হাজার ফিট উঁচু থেকে প্রবালের ওপর ফেলা হবে। প্রচণ্ড একটা কম্পন সৃষ্টি করাই বোধহয়

উদ্দেশ্য—তার মানে ভূমিকম্প।'

'কিন্তু আমার তো ধারণা, এই উদ্দেশ্য গ্রাউণ্ড এক্সপ্লোসিভের সাহায্যেও পূরণ হতে পারে।'

কাঁধ ঝাঁকাল স্যাণ্ডেকার। 'এসব বিষয়ে আমি তাঁকে কোনো প্রশ্ন করিনি। সিসমোলজিস্ট তো আর নই!'

'সে যাই হোক,' বললেন মরগান, 'এই নির্দিষ্ট ধরনের ন্যাভাল শেল কোথায় পাওয়া যাবে বলে মনে করেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন?'

'তাঁর ধারণা, কিছু ষোল ইঞ্চি শেল এ. এ. আর-এর কাছে থাকতে পারে।'

চায়ের কাপে চুমুক দিলেন মরগান, ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছলেন। 'কোনো সারপ্লাস আর্মস ডিলারের কাছ থেকে কেনার চেষ্টা করলেই তো হয়, এ. এ. আর-এর সাথে যোগাযোগ করার দরকারটা কি?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে স্যাণ্ডেকার। 'একসময় কিছু ষোল ইঞ্চি এক্সপেরিমেণ্টাল টাইপ ন্যাভাল শেল তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু কখনও ব্যবহার করা হয়নি—ঠিক সেগুলোই দরকার অ্যাডমিরালের।'

'ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোরাল লাগছে আমার কাছে,' বললেন মরগান। 'এ. এ. আর-এর কাছে শেলগুলো যদি থাকেও, অ্যাডমিরাল সেগুলো হস্তগত করবেন কিভাবে?'

'হয়ত ভালো দাম দিয়ে কিনে নেবার চেষ্টা করবেন···ঠিক জানি না। সরকারের টাকা, খরচ করতে অসুবিধে কি!' কৌতুক

করল স্যাণ্ডেকার।

হঠাৎ স্যাণ্ডেকারকে প্রায় চমকে দিয়ে মরগান বললেন, 'আচ্ছা, মাসুদ রানার সাথে অ্যাডমিরালের সম্পর্ক কি? ছেলেটা বলতে গেলে তাঁর অফিসেই আস্তনা গেড়েছে—ব্যাপারটা কি?'

রিস্টওয়াচ দেখল স্যাণ্ডেকার। 'মাসুদ রানা? তার সাথে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সম্পর্ক? কি জানি! বলতে পারব না। আমাকে এবার যেতে হয়, চীফ। শেলগুলোর ব্যাপারে যদি কোনো সূত্র পান, আমাকে জানাবেন, প্লীজ। অ্যাডমিরাল আমার পুরনো বন্ধু, অনেক ব্যাপারে আমি তাঁর কাছে ঋণী। তাঁর সাহায্যে লাগতে পারলে কিছুটা অন্ততঃ ঋণ মুক্ত হতে পারব।'

'ঠিক আছে,' বললেন মরগান, 'যোগাযোগ করব আমি।' স্যাণ্ডেকার চলে যাবার পর আরেক কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন তিনি, তারপর গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

দশ মিনিট পর নিজের অফিসে ফিরে এলেন মরগান। বারবারাকে ডেকে বললেন, 'হ্যাঁ, এবার সেই কাজটা করতে পারো তুমি, বারবারা।'

'স্যার?' দু'চোখে রাজ্যের প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে পার্সোন্যাল সেক্রেটারী বারবারা।

'মাসুদ রানার কথা বলছি,' বললেন মরগান। 'আমার ফোন নাম্বারটা যাতে সে পায়, তার ব্যবস্থা করো।'

ওয়াশিংটন। সাতই ডিসেম্বর।

বিকেল চারটে। ক্যাপিটল ইন। প্রায় নির্জন রেস্তোরাঁ, দুটো মাত্র টেবিলে লোক রয়েছে। একটায় দুটো অল্প-বয়েসী ছেলে মেয়ে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে নিচু গলায় কথা বলছে, আর কোনো-দিকে খেয়াল নেই তাদের। আরেকটায় একা বসে সিগারেট ফুঁকছে রানা। এই সময় একজন ভদ্রলোক ঢুকলো ভিতরে। ঝাড়া ছয় ফিট লম্বা, মেদহীন সুঠামো শরীর, মাথায় মস্ত কার্নিশ-ওয়ালা হ্যাট, কানের দু'পাশে কাঁচা-পাকা চুল। বয়স হয়েছে, কিন্তু হঠাৎ তাকালে টের পাওয়া যায় না। হাঁটার ভঙ্গিটা দৃঢ়, চেহারায় অটল আত্মবিশ্বাসের ছাপ। সোজা এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়ালেন।

'আপনি মাসুদ রানা?' জানতে চাইলেন তিনি।

'আপনি ডেভিড মরগান?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

মাথা ঝাঁকালেন মরগান। 'হ্যাঁ।'

উঠে দাঁড়ালো রানা, হাতটা বাড়িয়ে দিল হ্যাণ্ডশেক করার জন্যে। তারপর সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল। 'বসুন, মিঃ মরগান।'

ধীরে ধীরে বসলেন এন. এস. এ. চীফ। হাতের ব্যাগ খুলে চুরুটের প্যাকেট আর লাইটার বের করছেন, কিন্তু তাকিয়ে আছেন রানার দিকে।

'আপনার জন্যে কি আনাব বলুন,' জানতে চাইল রানা। 'হুইস্কি, নাকি ব্র্যাণ্ডি?'

'পরে,' মৃদু গলায় বললেন মরগান। 'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে সত্যি খুব খুশি হয়েছি আমি, মিঃ রানা। আপনি

জানেন আমি কে ?'

'না।'

'তবু আমার সাথে দেখা করতে আপত্তি করেননি !'

'বলতে পারেন, কৌতূহলেরই জিত্ হয়েছে,' বলল রানা, হাসছে। 'এর আগে আমার গাড়ির উইণ্ডশিল্ডে কেউ কখনো কোনো চিরকুট সেঁটে যায়নি। আপনি কে জানি না, কিন্তু ফোন নাম্বারটা এন. এ. এস. এ.-র তা জানি।'

'আপনাকে অনুসরণ করা হচ্ছিল, নিশ্চয়ই তা বুঝতে পেরেছিলেন আপনি ?' চুরুট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন মরগান।

'সময় নষ্ট করে লাভ নেই,' বলল রানা। 'আপনি বরং কাজের কথা পাড়ুন। ব্যাপারটা কি ?'

'ব্যাপার ?'

'আমার সম্পর্কে আপনার আগ্রহের কারণ।'

'ঠিক আছে, মঃ রানা, কাজের কথা পাড়ছি আমি,' বললেন মরগান। 'নুমা বিশেষ এক ধরনের হেভী ন্যাভাল শেল খুঁজছে কেন ? এর পিছনে উদ্দেশ্যটা কি ?'

'গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে হতো না ?' জানতে চাইল রানা।

'না, ধন্যবাদ,' রানা সময় নষ্ট করছে বুঝতে পেরে চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মরগানের।

'প্রশ্নটা আমাকে করার কারণ ?' জানতে চাইল রানা।

'কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে,' বললেন মরগান। 'তার আগে আমার সম্পূর্ণ পরিচয়টা জানা দরকার আপনার। আমি এন.

এস. এ চীফ। জানতে পেরেছি নুমার সাথে কাজ করছেন আপনি, কিসের ভিত্তিতে তা জানি না। সম্ভবতঃ ওই ন্যাভাল শেলগুলো সম্পর্কে আপনার কোনো আগ্রহ আছে। নাকি ভুল অনুমান করছি আমি ?'

ডেভিড মরগান ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি এজেন্সীর চীফ, কথা-টা শুনে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না রানার মধ্যে, অন্ততঃ বাইরে থেকে তার চেহারা দেখে মনে হলো একটুও আশ্চর্য হয়নি সে।

'নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন আমাকে স্নেহ করেন, আমি তাঁকে একটা ব্যাপারে সাহায্য করছি। আর কিছু জানার আছে আপনার, মিঃ মরগান ?'

'আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর কিন্তু পাইনি এখনো। হেভী ন্যাভাল শেল, কি দরকার ওগুলো অ্যাডমিরালের ?'

'আপনি জানেন ওগুলো দরকার,' বলল রানা, 'তার মানে কেন দরকার তাও আপনার অজানা নেই।'

'প্রবাল নিয়ে সিসমোলজিক্যাল টেস্ট ?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা।

দাঁত দিয়ে চুরুটটা কামড়ে ধরে মাথাটা একটু তুলে ভালো করে তাকালেন মরগান রানার দিকে। 'টেস্টের তারিখ ?'

'আগামী বছর, মার্চের শেষ দুই হপ্তা।'

'আই সি,' একটা ভুরু কপালে তুলে বললেন মরগান। পর-মুহূর্তে চেহারায় গাম্ভীর্য ফুটে উঠল। 'নুমার দু'জন সিসমোলজি-স্টের সাথে আমি নিজে কথা বলেছি, মিঃ রানা। প্লেন থেকে

ষোলো ইঞ্চি ন্যাভাল শেল ফেলা হবে শুনে হেসেই অস্থির তারা। সিসমোলজিক্যাল টেস্টের জন্যে ওই শেলের কোনো প্রয়োজনই নেই। তারা আমাকে আরো জানিয়েছে, ও-ধরনের কোনো প্রোগ্রামও নুমার হাতে নেই। তার মানে? নুমা কিছু লুকাচ্ছে। কি সেটা, মিঃ রানা?'

'আমি আবার জানতে চাইছি,' বলল রানা, 'এসব প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করার কারণ?'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলেন মরগান, তারপর মৃদু গলায় বললেন, 'কবীর চৌধুরীর সাথে এই শেলের কোনো সম্পর্ক আছে কি, মিঃ রানা?'

স্তব্ধ হয়ে গেল রানা। 'কি জানেন আপনি কবীর চৌধুরী সম্পর্কে?' জেরা করার ভঙ্গিতে জানতে চাইলো সে।

'বলব,' মৃদু হেসে বললেন মরগান। 'কিন্তু তার আগে আমার কৌতূহল মেটান আপনি।'

'কবীর চৌধুরীর সাথে এই শেলের সম্পর্ক আছে কিনা, আমি জানি না।'

'শেলগুলো কেন খুঁজছেন আপনারা?' জানতে চাইছেন মরগান।

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। শেলগুলো উদ্ধার করার আশা নেই বললেই চলে। এ এ. আর. সেগুলো কেনেনি, তাদের নাম করে অন্য কেউ কিনেছে। এই অন্য কেউ কে, তার পরিচয় কি, এসব প্রশ্নের উত্তর বের করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। কুইক-ডেথ ওয়রহেডগুলো কবীর চৌধুরীর হাতে যদি থাকে···বাকিটা

ভাবতেও সাহস পাচ্ছে না ও। নুমার সাধ্যমতো সমস্ত চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু শেলগুলোর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়, প্রফেশন্যালদের সাহায্য চাওয়া দরকার।

'কি ভাবছেন, মিঃ রানা?' বললেন মরগান। 'আপনার এবং কবীর চৌধুরী সম্পর্কে সবই জানা আছে আমার। তাকে নিয়ে আপনি যদি কোনো সমস্যায় পড়ে থাকেন, আমাকে জানাতে পারেন, আমি বোধ হয় আপনাকে সাহায্য করতে পারব।'

'কবীর চৌধুরীর সাথে ওই শেলগুলোর একটা সম্পর্ক থাকতে পারে, এ-কথা আপনার মনে হলো কেন?' প্রশ্ন করল রানা।

'অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন, মিঃ রানা?'

'অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'না। কেন?'

হেসে ফেললেন মরগান। বললেন, 'আপনি শুধু তথ্য আদায় করে নিতে চাইছেন। আপনিও কিছু ছাড়ুন, আমিও কিছু ছাড়ি—সেটাই তো ন্যায্য হবে, নয় কি?'

সিগারেট ধরাল রানা। 'ধরুন,' বলল ও, 'আমি আপনাকে একমুঠো মহামারীর বীজ দিলাম, যেটা তিনশো বছর ধরে কোনো বিরতি ছাড়াই যেখানে যতো প্রাণী পাবে সবাইকে সেই মুহূর্তে মেরে ফেলবে। কি করবেন আপনি ওটা নিয়ে?'

রানা ঠিক কি বলতে চাইছে বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকলেন মরগান, কয়েক সেকেণ্ড পর মৃদু গলায় বললেন, 'তার মানে?'

'উত্তর দিন,' বলল রানা।

'মহামারীর বীজ…ওটা কি কোনো মারণাস্ত্র ?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা।

অস্বস্তির ছায়া পড়ল মরগানের চেহারায়। 'এ-ধরনের কোনো অস্ত্রের কথা জানা নেই আমার। কেমিক্যাল আর বায়োলজিক্যাল অস্ত্র নিষিদ্ধ। জাতিসংঘের সমস্ত সদস্যের সমর্থন ছিল তাতে।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দিন, প্লীজ।'

'সরকারের হাতে তুলে দেবো, সম্ভবতঃ।'

'সেটা উচিত কাজ হবে বলে মনে করেন আপনি ?'

'গুড গড, ম্যান ! কি চান আপনি ? আপনার এই হেঁয়ালির মানে কি ?' শিড়দাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে মরগানের।

'এ-ধরনের অস্ত্র অবশ্যই ধ্বংস করে ফেলতে হবে,' বলল রানা। 'এই অস্ত্র দিয়ে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। কোনো সরকারকেও না।'

পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওরা।

'সত্যি কি এ-ধরনের অস্ত্রের অস্তিত্ব আছে ?' অবশেষে জানতে চাইলেন মরগান।

'আছে।'

তিক্ত একটু হাসি দেখা গেল মরগানের ঠোঁটে। 'মিঃ রানা, এবার আপনি আমার জন্যে খানিকটা নির্জলা হুইস্কির অর্ডার দিতে পারেন।'

ওয়েটার টেবিল সাজিয়ে দিয়ে চলে যাবার পর রানা বলল, 'এবার আপনি মুখ খুলুন 'মিঃ মরগান।'

'আপনি মহামারীর বীজের কথা বলছেন, সত্যি যদি তার কোনো অস্তিত্ব থাকে,···কি ভেবে চুপ করে গেলেন মরগান, একটু বিরতি নিয়ে আবার বললেন, 'গলাটা ভিজিয়ে নিতে দিন, তার-পর আমরা কিছু অশুভ খবর বিনিময় করব।'

'অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ··· ব্যাটলশিপ···কবীর চৌধুরী !' বিড় বিড় করে বলল রানা।

'আমার বিশ্বাস,' বললেন মরগান, 'কবীর চৌধুরীর অপারে-শন ওয়াইল্ড রোজের সাথে কুইক-ডেথের সম্পর্ক আছে।'

ধরে নেয়া গেল, ইউনিভার্সেল আর্মস কর্পোরেশন থেকে এ. এ. আর.-এর নামে সাঁইত্রিশটা শেল কিনেছে কবীর চৌধুরী, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে কুইক--ডেথ ভর্তি শেল আছে তা জানার কথা নয় তার। কুইক-ডেথের কথা বাইরের কেউ জানে না।'

'জানুক বা না জানুক তাতে বিপদের মাত্রা কমছে না,' বল-লেন মরগান। 'কোনো বড় শহরের ওপর শেলগুলো ফেলাই মনে হচ্ছে কবীর চৌধুরীর উদ্দেশ্য। দশ বিলিয়ন ডলারের চেক আটকে দেয়া আর ল্যাবরেটরী পুড়িয়ে দেবার প্রতিশোধ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সে এক হাত দেখিয়ে দিতে চাইছে। শেল-গুলো ছুঁড়তে শুরু করলে তাকে থামানো অসম্ভব, কুইক-ডেথ ভর্তি শেলের একটাই যে প্রথমে ছুঁড়বে না, তারই বা নিশ্চয়তা কি ?' ঘন ঘন টান দিচ্ছেন তিনি চুরুটে, কিন্তু ধোঁয়া বেরুচ্ছে না, অবশ্য সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই তাঁর। 'যা করার এখুনি করতে হবে, মিঃ রানা। গড নোজ, আরো কতো শেল

যোগাড় করেছে সে।'

'ব্যাটলশিপ সম্পর্কে আপনার রিপোর্ট কি বলে?' জানতে চাইল রানা।

'বেশিরভাগই বিভিন্ন সরকারী সংস্থার হাতে রয়েছে, কবীর চৌধুরী নাগাল পাবে না,' বললেন মরগান। 'আর বাতিল হয়ে গেছে যেগুলো সেগুলো লোহা-লক্কড়ের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। তারা ওগুলো ভেঙে মন দরে লোহা হিসেবে বেচবে।'

'আপনি শিওর?'

'আমি শিওর,' জোর দিয়ে বললেন মরগান।

'আরেকটা ব্যাপার,' চিন্তিতভাবে বলল রানা। 'অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ—এতো থাকতে অপারেশনের নাম হিসেবে এটা-কেই বা বেছে নিল কেন কবীর চৌধুরী? নামটার সাথে কিসের যেন একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু মনে করতে পারছি না।'

'অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ···ওয়াইল্ড রোজ···' আপন মনে বিড় বিড় করছেন মরগান।

'মনে পড়েছে!' বলল রানা। 'কিন্তু এর কোনো তাৎপর্য আছে কিনা বোঝা মুশকিল। আইওয়া রাজ্যের প্রতীক—ওয়া-ইল্ড রোজ।'

ঝট্ করে হাত বাড়ালেন মরগান। রানার কব্জি চেপে ধরে নাড়া দিলেন। 'মাই গড! ঠিকই তো! এর তাৎপর্য কি বুঝতে পারছেন? আইওয়া নামে একটা ব্যাটলশিপ আছে···'হঠাৎ সমস্ত উত্তেজনা অদৃশ্য হয়ে গেল তাঁর চেহারা থেকে। রানার

হাত ছেড়ে দিয়ে মাথা নিচু করলেন তিনি। 'কিন্তু...না, ব্যাটলশিপ আইওয়ার সাথে অপারেশন ওয়াইল্ড রোজের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না, আইওয়াকে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীরা...'

'কিন্তু ভাঙার জন্যে বিক্রি করা আর ভেঙে ফেলা, দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে, মিঃ মরগান,' বলল রানা।

হতভম্ব দেখাচ্ছে এন. এস. এ. চীফকে।

'মেরীল্যাণ্ডের তীর ঘেঁষা পশ্চিম চেসাপীকের সমস্ত শিপইয়ার্ডে খবর নেয়া উচিত, শান্ত গলায় বলল রানা।

'ফোন, ফোন!' প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মরগান। ছুটলেন। তার পিছু পিছু রেস্তোরাঁর ফোন বুথে এসে ঢুকল রানা।

দ্রুত ডায়াল করছেন মরগান। অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া পাবার অপেক্ষায় আছেন, এই ফাঁকে রানার দিকে ফিরে বললেন, 'আমি ট্যাক্সি নিয়ে এসেছি এখানে। আপনি?'

'নুমা একটা গাড়িতে।'

'ব্যবহার করতে পারব তো?'

'অবশ্যই,' বুথ থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'তেল-পানি ঠিক মতো আছে কিনা দেখে নিই তাহলে।'

দু'মিনিট পর রেস্তোরাঁ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে রানার পাশে উঠে বসলেন মরগান। 'আপনার অনুমানই ঠিক। গতকাল পর্যন্ত ব্যাটলশিপ আইওয়া ফর্বস মেরিন স্ক্র্যাপ অ্যাণ্ড সালভেজ ইয়ার্ডে ছিল, মেরীল্যাণ্ডে।'

'জায়গাটা চেনা আছে আমার,' বলল রানা। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল ও। 'পাটুকজেন্ট নদী যেখানে বে-তে মিলেছে তার কয়েক মাইল এদিকে।'

ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। গাড়ির উইণ্ডশীল্ড ওয়াইপারের দিকে সম্মোহিতের মতো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ডেভিড মরগান। তাকিয়ে আছেন, কিন্তু কিছুই যেন দেখছেন না। তাঁর পাশে বসে একমনে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। একসময় স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে এলো মরগানের চোখে, রাস্তার দিকে তাকালেন তিনি।

'সামনে বোধহয় লেক্সিনটন পার্ক?' জানতে চাইলেন।

'আর চার মাইল,' রাস্তার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে বলল রানা।

'শহরে ঢোকার মুখেই একটা অল-নাইট গ্যাস স্টেশন আছে, পে ফোনের সামনে থামবেন একবার।'

কয়েক মিনিট পর হেডলাইটের আলোয় লেক্সিনটন পার্ক সিটি-লিমিট সাইন দেখা গেল রাস্তার পাশে, আরো মাইল খানেক এগোবার পর তীক্ষ্ণ একটা বাঁক, বাঁক ঘুরতেই উজ্জ্বল আলোকমালায় সাজানো সার্ভিস স্টেশনটা দেখতে পেল রানা। ফোন বুথের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল ও। দরজা খুলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন মরগান, কিন্তু গা বাঁচাতে পারলেন না, বুথের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন ভিজে সপসপে হয়ে। কাঁচ ঘেরা অফিসে বসে একটা পত্রিকা পড়ছে অ্যাটেনড্যান্ট, ছিন-তাইকারী নয় বুঝতে পেরে ওদের সম্পর্কে সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে

ফেলল।

দু'মিনিট পর গাড়িতে ফিরে এলেন মরগান। গাড়ি ছেড়ে দিল রানা।

'নতুন কিছু জানা গেল?'

মাথা দোলালেন মরগান। 'একটা খবর যোগাড় করেছে আমার লোকেরা, কিন্তু সুখবর নয়।'

একটু গম্ভীর হলো রানার চেহারা। 'দুর্যোগ আর দুঃসংবাদ হাত ধরাধরি করে আসে।'

'ব্যাটলশিপ আইওয়াকে নিলামে বিক্রি করে দিয়েছে নেভী,' বললেন মরগান। 'ওয়ালভিস বে ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন কিনেছে ওটা।'

'নামটা আগে শুনিনি,' বলল রানা। 'কাদের করপোরেশন?'

'আফ্রিকান আর্মি অব রেভোলিউশনের আর্থিক দিকটা দেখাশোনা করে ওরা,' মৃদু গলায় বললেন মরগান। 'তার মানে, নিজের পরিচয় গোপন করার জন্যে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি কবীর চৌধুরী।'

'ওই সামনে দেখা যাচ্ছে ফর্বস শিপইয়ার্ড,' বলল রানা।

কাঁটাতারের উঁচু বেড়া রাস্তার সাথে সমান্তরালভাবে এগিয়ে গেছে, মেইন গেটের সামনে ঘ্যাচ্ করে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। গেটের বাইরে একটা গার্ডরুম, মাথায় ফ্লাড লাইট। গেটটা খোলা, কিন্তু মুখে একটা চেইন বাধা হয়ে রয়েছে। উইণ্ডস্ক্রীনের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছে রানা, কিন্তু ঝমঝম বৃষ্টি আর অন্ধকারে বেশি দুর দেখা যাচ্ছে না। বর্ষণের অঝোর ধারায়

ঢাকা পড়ে গেছে জাহাজ, এমন কি আকাশ ছোঁয়া ডেরিক-গুলোকেও দেখতে পাচ্ছে না ও।

গাড়ির দরজার পাশে, রানার দিকে, একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল। 'আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারি?'

পকেটে হাত ভরলেন মরগান, আই-ডি কার্ড বের করে ভাঁজ খুললেন সেটার, তারপর রানার দিকে কাত্ হয়ে জানালার কাঁচের সাথে সেঁটে ধরলেন সেটা। 'শিপইয়ার্ডে আইওয়া আছে কিনা জানতে এসেছি,' বললেন তিনি।

'নিশ্চয়ই আছে, স্যার,' সবিনয়ে বলল গার্ড। 'গত ছ'মাস থেকে ডক ছেড়ে যায়নি কোথাও। রিফিটিঙের কাজ চলছে এখন।'

মরগান আর রানা দৃষ্টি বিনিময় করল।

'আমরা নিজেরা দেখব,' বৃষ্টির মধ্যে মাথা বের করে গার্ডকে বলল রানা।

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল গার্ড। 'মাফ করবেন, স্যার,' বলল সে। 'কোম্পানীর অফিস থেকে পাস না আনলে আমি কাউকে ঢুকতে দিতে পারি না। সকালে আমাদের অফিসের লোক আসবে, তার সাথে কথা বলে দেখতে পারেন। তিনি যদি অনুমতি দেন, আপনারা ভেতরে ঢুকে দেখতে পারবেন জাহাজ।'

কড়া ধমক লাগাতে যাচ্ছিলেন মরগান, এই সময় গাড়ির পাশে আরেকটা গাড়ি এসে থামল। জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিয়ে এক লোক জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার, ও'হারা?'

গার্ড ও'হারা উত্তর দেবার আগেই ঝট্ করে গাড়ির দরজা খুলে নিচে নেমে পড়লেন মরগান, বৃষ্টির ঝমঝম শব্দকে ছাপিয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বর, 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর ডিরেক্টর আমি, ডেভিড মরগান।' কাঁধের ওপর দিয়ে বুড়ো আঙ্গুল বাঁকা করে গাড়িতে বসা রানার দিকে ইঙ্গিত করলেন, 'উনি আমার বন্ধু, মাসুদ রানা, একটা ইনভেস্টিগেটিং ফার্মের ডিরেক্টর। অত্যন্ত জরুরী একটা ব্যাপারে ব্যাটলশিপ আইওয়াকে দেখতে এসেছি আমরা।'

পাশে বসা একটা মেয়েকে কি যেন বলল আগন্তুক, তারপর দ্রুত নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। মরগানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই রাত তিনটের সময়?' মরগানের হাত থেকে আই-ডি কার্ডটা নিয়ে ফ্লাড লাইটের নিচে গিয়ে দাঁড়াল সে। কার্ডের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মরগানকে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, ও'হারা, চেইন তুলে নাও।' মরগানের দিকে তাকাল আবার। 'গাইড না করলে ডকে পৌছুতে অসুবিধে হবে আপনাদের, আমিও যাচ্ছি আপনাদের সাথে। আমার পরিচয়···শিপইয়ার্ডের সুপারিনটেনডেন্ট, ডেল জারভিস।' নিজের গাড়ির কাছে ফিরে গেল সে। প্যাসেঞ্জার সীটে বসা মেয়েটাকে নিচু গলায় কি যেন বলল, তারপর ফিরে এলো আবার। ইতিমধ্যে রানার পাশে উঠে বসেছেন মরগান, রুমাল দিয়ে ভিজে চোখ আর নাক মুছছেন। গাড়ির ব্যাকসীটে উঠে বসল জারভিস। রানার কাঁধের কাছ থেকে বলল, 'আজ আমাদের বিয়ে-বার্ষিকী, উৎসব থেকে বাড়ি ফেরার পথে শিপইয়ার্ড

হয়ে যাবার কারণ কিছু ব্লু-প্রিণ্ট সাথে করে নিয়ে যাবো ভেবেছিলাম।'

চেইনটা সরিয়ে দিল ও'হারা। রানা গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে দেখে হাত দেখিয়ে থামতে ইশারা করল ওকে, তারপর জানালার সামনে ঝুঁকে পড়ে তাকাল সুপারিনটেনডেন্টের দিকে। 'স্যার, বাস ড্রাইভারের সাথে দেখা হলে তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এতো দেরি করছে কেন সে?'

'বাস ড্রাইভার?' অবাক হয়ে জানতে চাইল ডেল জারভিস।

'সন্ধ্যে সাতটার দিকে প্রায় সত্তর জন কালা আদমী নিয়ে ঢুকেছে বাসটা,' বলল ও'হারা। 'বাস থেকে নেমে আইওয়ার দিকেই তো গেল ওরা।'

'তুমি ওদেরকে ঢুকতে দিলে?' বিস্ময় আর অবিশ্বাসের সাথে জানতে চাইল ডেল জারভিস।

'ওদের সবার কাছে পাস ছিল, স্যার,' বলল ও'হারা। 'বাসের পিছু পিছু একটা ট্রাকও ঢুকেছে, তার ড্রাইভারের কাছেও পাস আছে।'

'ক্যাপ্টেন ফক্স!' রাগে মুখটা লাল হয়ে উঠেছে জারভিসের। 'লোকটা দেখছি পাগলামির সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে!'

গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। 'ক্যাপ্টেন ফক্স? কে তিনি?'

'এ. এ. আর এর তরফ থেকে ক্যাপ্টেন ফক্সই তো আইওয়ার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে। স্রেফ একটা উন্মাদ বলতে পারেন।'

ঘাড় ফিরিয়ে জারভিসের দিকে তাকালেন মরগান। 'কি

রকম ?'

'শুনলে হাসবেন, বিশ্বাস করতে চাইবেন না,' বলল সুপারিনটেনডেন্ট। 'ক্যাপ্টেন ফক্স আমার ক্রুদেরকে দিয়ে আইওয়ার অর্ধেক সুপারস্ট্রাকচার ভেঙে ফেলে দিয়ে তার জায়গায় কাঠের নকল জিনিস বসিয়েছে। শুধু সুপারস্ট্রাকচার নয়, জাহাজটার বাল্কহেড থেকে শুরু করে যা কিছু তার কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে সবই ভেঙে ফেলে দিয়েছে সে।'

'সে কি! কারণ ?'

'আইওয়ার ওয়াটার লাইন নামাতে চায়,' বলল জারভিস। 'তার ধারণা, ওজন কমাতে পারলেই তা সম্ভব।'

'কিন্তু আমি যতোটুকু জানি,' বললেন মরগান, 'কর্কের মতো পানিতে ভাসাবার জন্যে তৈরি করা হয়নি এ-ধরনের ব্যাটলশিপ। ভাসমানতা আর ভারসাম্য যদি কমবেশি করা হয়, ঝড়ের মুখে টিকতে পারবে না, ডুবে যাবে।'

'এই নিয়ে তার সাথে আমি দিনের পর দিন তর্ক করেছি,' বলল জারভিস। 'কোনো লাভ হয়নি। ভয়ঙ্কর জেদী লোক, কারো কথা শুনতে চায় না। শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, নিখুঁত ইলেকট্রিক টারবাইন ইঞ্জিন দুটোকেও ফেলে দিতে চেয়েছিল সে। বলে কিনা, ইঞ্জিন দুটোকে সরিয়ে সীল করে দিন ওগুলোর শ্যাফট্।' থামল সে, টোকা দিল রানার কাঁধে। 'স্টীল প্লেটিঙের ওই স্তূপটা পেরিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নেবেন, তারপর আবার ডেরিকের রেইল ট্র্যাকের কাছে ডান দিকে।'

বৃষ্টির অঝোর ধারা বরফের তৈরি চাদরের মতো লাগছে,

গাড়ির ভেতর ভিজে শরীর নিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছেন মরগান। কাঁপা হাতে একটা চুরুট ধরিয়ে কষে টান দিলেন তিনি। হেড-লাইটের আলোয় প্রকাণ্ড আকারের দুটো বাক্সের মতো আকৃতি ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে দেখছে রানা। 'ওই যে দেখা যাচ্ছে বাস আর ট্রাক,' বলল ও। আরো খানিক এগিয়ে ট্রাকের পাশে দাঁড় করাল গাড়ি।

'ড্রাইভাররা নেই কেন?'

গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে একটা টর্চ বের করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা। ওকে অনুসরণ করে মরগানও নামলেন। জারভিস নামল পিছনের দরজা দিয়ে. কাউকে কিছু না বলে দ্রুত অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

ট্রাকের পিছন আর বাসের জানালা দিয়ে টর্চের আলো ফেলে ভেতরে তাকাল রানা। দুটোই খালি।

খালি গাড়ি দুটোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল রানা, ভিজে চুরুট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করছেন মর-গান। খানিক দূর এগিয়ে এসে রানা দেখল, পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জারভিস। হাত দুটো মুঠো পাকানো, শরীরের দু'পাশে টান টান হয়ে ঝুলছে। ভিজে সপসপ করছে গায়ের জ্যাকেটটা, মাথার খুলি কামড়ে সেঁটে বসে আছে চুলগুলো কংক্রিটের মতো, পানি থেকে উঠে আসা ভূতের মতো চেহারা হয়েছে লোকটার।

'কোথায় আইওয়া?' তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইলেন মরগান।

হাত তুলে সামনের অন্ধকার দেখাল ওদেরকে জারভিস।

বিড় বিড় করে বলল, 'নেই!'

'নেই মানে!'

'পাগলা লোকটা…ক্যাপ্টেন ফক্স…জাহাজ নিয়ে চলে গেছে!'

'ওহ্ গড! আপনি শিওর?' জারভিসের দিকে এক পা এগোলেন মরগান।

'একটা ব্যাটলশিপ দেখতে পাবো না, অতোটা অন্ধ নই আমি, মিঃ মরগান,' গম্ভীর গলায় বলল জারভিস। 'ভাঙাচোরার সময় ঠিক এইখানে নোঙর করা ছিল।' হঠাৎ কি যেন দেখতে পেয়ে এক ছুটে ডকের কিনারায় দাঁড়াল সে। 'কি সর্বনাশ, কাণ্ড দেখুন! ডক বোলার্ডের সাথে নোঙরের লাইন এখনও বাঁধা রয়েছে! মাই গড! লাইনগুলো জাহাজ থেকে ফেলে দিয়েছে ওরা! এর মানে কি? আইওয়া কি নোঙর ফেলবে না কখনো?'

ঝুঁকে পড়ে তাকালেন মরগান। ভারি লাইনগুলো কালো পানিতে অদৃশ্য হয়ে গেছে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন তিনি।

'এখানে আর দেখার কিছু নেই,' তাঁর পিছন থেকে বলল রানা। 'ফিরে চলুন, মিঃ মরগান।'

গাড়ি নিয়ে শিপইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এলো রানা।

'কি হবে এখন, মিঃ রানা?' শুকনো একটা চুরুট ধরিয়ে জানতে চাইলেন মরগান।

'কবীর চৌধুরী হামলা করবে, সন্দেহ নেই,' বলল রানা। 'কিন্তু যদি জানা যেত কবে, কখন, কোথায়…'

'নির্দিষ্ট কোনো তারিখ আছে বলে মনে করেন?'

হঠাৎ প্রায় চমকে উঠল রানা। ঝট্ করে তাকাল মরগানের দিকে। 'আজ ক'তারিখ? সাত?'

'হ্যাঁ। সাতই ডিসেম্বর। কেন?'

ঘ্যাচ্ করে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলল রানা।

'কি হলো?' প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে আঁতকে উঠলেন মরগান।

'ডিসেম্বরের সাত···আজকের দিনেই পার্ল হারবারে বোমা ফেলা হয়েছিল!' রুদ্ধশ্বাসে বলল রানা। 'আমেরিকাকে আক্রমণ করার জন্যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটা দিন বেছে নিয়েছে কবীর চৌধুরী।'

ফিশিং ট্রলার মলি বেণ্ডার।

ব্যারোমিটারটা দেখে নিয়ে চার্ট টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল স্কিপার কার্ল সুইড, ধূমায়িত কফির কাপটা তুলে নিয়ে ছোট্ট একটা চুমুক দিল। কল্পনায় নদীর সামনেটা দেখতে চেষ্টা করছে সে, তাকিয়ে আছে ডেকে জমে ওঠা তুষারের দিকে। তার এই সত্তর বছর বয়সে দুর্যোগের রাত কম দেখেনি সে, কিন্তু আজকের রাতটা কেমন যেন একটা খুঁতখুঁতে ভাব এনে দিয়েছে তার মনে। কেন যেন আজ তার বড় বেশি করে মনে পড়ে যাচ্ছে স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের কথা। আরো দশ বছর আগে অবসর নেয়া উচিত ছিল তার, কিন্তু স্ত্রী মারা যাবার পর ছেলেমেয়েরাও দুনিয়ার চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, বাড়িতে একা বসে সময় কাটে না তার, তাই ছাড়ি ছাড়ি করেও চাকরিটা ছাড়তে পারে নি সে। পারবেও না। মনে মনে জানা আছে তার, এই

পানিতে ভাসতে ভাসতেই হঠাৎ একদিন টুপ করে মরে যাবে সে।

'অন্ততঃ সিকি মাইল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে,' বিড় বিড় করে বলল সে।

'আরো খারাপ হতে পারে আবহাওয়া,' হেলমের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে সহকারী অসকার, স্কিপারের উদ্বেগ লক্ষ্য করে নিঃশব্দে হাসছে সে। মাত্র আটাশ বছর বয়স, বুক ভরা দুর্জয় সাহস।

লেদার জ্যাকেটের বোতাম লাগাচ্ছে স্কিপার। 'হেলমের দিকে নজর রাখো, আর সাবধান, র‍্যাগড পয়েন্ট চ্যানেল বয়ার কাছ থেকে দূরে সরে থেকো।'

'আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, স্কিপার। ব্লাডহাউণ্ডের মতো চ্যানেল মার্কারের গন্ধ পাই আমি।'

রূঢ় শোনাল স্কিপারের গলা, 'নাক নয়, আমি চাই তুমি তোমার চোখ ব্যবহার করো।'

র‍্যাগড পয়েন্ট পেরিয়ে এসে ভাটির দিকে নিজস্ব কোর্সে ছুটে চলেছে মলি বেণ্ডার। আলোকিত চ্যানেল বয়াগুলো একের পর এক চলে যাচ্ছে পাশ ঘেঁষে। বর্ষণের অঝোর ধারার ভেতর দিয়ে বহু দূরের আলো ঝাপসা দেখাচ্ছে।

'উজান ঠেলে কে যেন আসছে,' ঘোষণার সুরে বলল অসকার।

বায়নোকুলার তুলে নিয়ে বো-র পিছন দিকে তাকাল স্কিপার কার্ল সুইড। 'লিডশিপে তিনটে সাদা আলো দেখতে পাচ্ছি।

তারমানে পিছনে টো নিয়ে একটা টাগ। ঝাপসা অন্ধকারে ওটার কাঠামো দেখা যাচ্ছে না। তবে, অস্বাভাবিক লম্বা টো মনে হচ্ছে। টাগের পিছনে, একই লাইনে প্রায় তিনশো গজ দূরে দুটো থারটি-টু-পয়েন্ট সাদা আলো দেখা যাচ্ছে। পিছনের সর্বশেষ টো বোধহয় ওটাই।'

'কিন্তু মুখোমুখি সংঘর্ষের কোর্সে এগোচ্ছি আমরা, স্কিপার,' একই সরল রেখায় রয়েছে ওটার মাস্ট লাইট আর আমাদের বো।'

'নদীর এটা আমাদের দিক, ও শালারা কি করছে এদিকে?' রাগে গজগজ করে উঠল বুড়ো সুইড। 'স্কিপার ব্যাটা জানে না দুটো জাহাজ পরস্পরের দিকে যখন এগোবে, প্রত্যেকের স্টার-বোর্ড সাইড তীরের দিকে রাখতে হবে?'

'ওদের চেয়ে অনেক দ্রুত দিক বদলাতে পারব আমরা,' বলল অসকার। 'ওদেরকে বরং আমরা সতর্ক করে দিই, আর যে যার স্টার বোর্ড সাইড দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাই।'

'ঠিক আছে, অসকার। দু'বার হুইসেল বাজিয়ে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দাও ওদেরকে।'

কিন্তু উত্তরে পাল্টা কোনো হুইসেলের আওয়াজ পেল না ওরা। হঠাৎ উপলব্ধি করল কার্ল সুইড, অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে টাগের আলো। টাগ? সন্দেহের প্রথম দোলা লাগল তার মনে। পিছনে টো নিয়ে কোনো টাগ এই রকম তীর বেগে আসতে পারে? 'কোর্স বদলাও! পোর্টের দিকে!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে।

সাথে সাথে নির্দেশ পালন করল অসকার। পরমুহূর্তে হতভম্ব হয়ে গেল স্কিপার কার্ল সুইড। ট্রলারের কোর্সের সাথে রহস্যময় টাগটাও তার কোর্স বদলেছে। সোজা ছুটে আসছে মলি বেণ্ডারের দিকে। পথরোধ করাই যেন উদ্দেশ্য।

'হুইসেল বাজাও। বেজন্মাটাকে হুইসেল বাজিয়ে সতর্ক করে দাও!' থরথর করে কাঁপছে স্কিপার।

চারবার সংক্ষিপ্ত আওয়াজ—মানে, ইনল্যাণ্ড ওয়াটারওয়ে ডেঞ্জার সিগন্যাল। উল্টো দিক থেকে আসছে এমন কোনো জলযানের উদ্দেশ্য বা কোর্স বোঝা না গেলে বাজানো হয়। হুইসেলের তীক্ষ্ণ শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে দু'জন ক্রুর, চোখ কচলাতে কচলাতে হুইল হাউসে ঢুকল তারা, ঢুকেই দেখল আশ্চর্য একটা আলো দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ভয়ে আর বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল তারা।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড সময় পেল স্কিপার কার্ল সুইড। ছোঁ মেরে বুলহর্ণটা তুলে নিয়ে হুংকার ছাড়ল সে, 'হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! পোর্টের দিকে ঘোরো, খোদার দোহাই...!'

সচল একটা পাহাড় অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে যেন, নিঃশব্দে। কেউ কোনো উত্তর দিল না। হীম-শীতল অন্ধকার থেকে কোনো পাল্টা হুইসেল বেজে উঠল না। অসহায় মলি বেণ্ডারের ওপর হিংস্রদৃষ্টিতে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে শুধু দ্রুতগতির আলোগুলো।

সংঘর্ষ অবধারিত বুঝতে পেরে জানালার নিচের ফ্রেমটা দু'-হাত দিয়ে আলিঙ্গন করে ধরল স্কিপার কার্ল সুইড। শেষ মুহূর্ত

পর্যন্ত লড়ল সহকারী অসকার, উন্মত্ত ব্যস্ততার সাথে উল্টোদিকে চালালো ইঞ্জিনগুলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল অসকারের হাত দুটো। হুইল হাউসের মাথার অনেক ওপর পর্যন্ত কি যেন দেখতে পাচ্ছে সে। রঙটা কাল। তারপর চিনতে পারল অসকার। একটা প্রকাণ্ড জাহাজের বো। দেখল, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারল না। পরমুহূর্তে ছোট্ট ট্রলার-টাকে ধাক্কা দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল আইওয়া। ঠাণ্ডা বরফ পানির নিচে তলিয়ে গেল সব।

হোয়াইট হাউসের গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছেন ডেভিড মরগান, হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন রানার দিকে। 'সহযোগিতার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, মিঃ রানা,' আন্তরিকতার সাথে বললেন তিনি।

'কি করবেন এখন আপনি?' জানতে চাইল রানা।

'যতই বকাঝকা খেতে হোক,' বললেন মরগান, 'প্রেসিডেন্ট আর চীফস অব স্টাফকে ঘুম থেকে তুলব এখন আমি।' ক্লান্ত হাসি দেখা গেল তাঁর মুখে। 'এই ভয়ংকর পরিস্থিতি সামলানোর দায়িত্ব ওঁদের হাতেই থাকা উচিত।'

'আমি কোনো সাহায্যে লাগতে পারি?'

'না। আপনি আপনার সাধ্যের চেয়ে বেশি করেছেন। এখন থেকে যা করার ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট করবে।'

'কুইক-ডেথ ওয়রহেড,' বলল রানা। 'ওগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হলে ধ্বংস করা হবে বলে কথা দিতে পারেন আপনি?'

'কথা দিচ্ছি চেষ্টা করব, কিন্তু সাফল্যের গ্যারান্টি আমি দিতে পারি না।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'উত্তরটা পছন্দ হলো না আমার।'

তর্ক করার মতো উৎসাহ বোধ করছেন না মরগান, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে তাঁর শরীর। 'দুঃখিত, মিঃ রানা। মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয়া আমার স্বভাব নয়।' গাড়ি থেকে নেমে গেলেন তিনি। গার্ডকে পাস দেখিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন হোয়াইট হাউসের ভেতর।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ভারমন্ট এভিনিউয়ের দিকে যাচ্ছে রানা। দু'মাইল এগিয়ে একটা অল-নাইট কফি-শপ দেখতে পেয়ে দাঁড় করাল গাড়ি।

ভেতরে ঢুকে কফির অর্ডার দিল রানা। তারপর ফোনের বুথে ঢুকে দু'জায়গায় ফোন করল। তারপর কফিটুকু গলায় ঢেলে দ্রুত বিদায় নিল।

পাঁচ

বেথেসডা ন্যাভাল হাসপাতাল।

ওয়েটিংরুমে রানার জন্যে অপেক্ষা করছে হিলি। আকাশী রঙের একটা স্কার্ফ তার সোনালী চুলের অর্ধেকটা ঢেকে রেখেছে। চোখের নিচে কালি পড়লেও, চেহারায় তারুণ্যের একটা তর-তাজা ভাব ফুটে রয়েছে। রানাকে দেখেই সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

'কেমন আছেন অ্যাডমিরাল?' ভেতরে ঢুকেই জানতে চাইল রানা।

ক্লান্ত চোখ দুটো রানার মুখের ওপর কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে থাকল। তারপর বলল হিলি, 'এখনও যুঝছেন। পরাজয় কাকে বলে জানেন না, এবারও সুস্থ হয়ে উঠবেন বাবা।'

ওয়েটিংরূমে ঢোকার আগে বড় ডাক্তরের সাথে কথা বলে এসেছে রানা, তাই হিলির একটা কথাও বিশ্বাস করল না ও। লক্ষ্য করল হিলির চোখেও হতাশার ছায়া, কথাগুলো সে নিজেও

হয়ত বিশ্বাস করে না। হালকাভাবে ওর কোমরে একটা হাত রেখে ওয়েটিংরুমে থেকে করিডোরে বের করে আনল তাকে রানা। 'অ্যাডমিরাল কথা বলতে পারবেন আমার সাথে?'

মাথা ঝাঁকাল হিলি। 'আপনার মেসেজ পাবার পর ডাক্তার-দের কথা কানে তুলছেন না বাবা, আপনার সাথে কথা বল-বেনই।'

'অত্যন্ত জরুরী না হলে এই অবস্থায় তাঁকে আমি বিরক্ত করতাম না,' মৃদু গলায় বলল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে রানার চোখের দিকে তাকাল হিলি। 'তা আমি বুঝতে পারছি।'

কেবিনের সামনে দাঁড়াল ওরা। দরজা খুলল হিলি। নিঃ-শব্দ ইঙ্গিতে ভেতরে ঢুকতে বলল রানাকে।

সেক্সটন জিরো-ফাইভ কলোরাডোর টেবল লেক থেকে তোলার সময় শেষবার দেখেছিল রানা অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেন-টন স্কটকে। মাত্র কয়েক দিন আগের কথা, কিন্তু এরই মধ্যে আরো যেন দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে অ্যাডমিরালের। শুকিয়ে গেছে মুখটা, পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। বালিশের ভেতর ডুবে রয়েছে প্রকাণ্ড মাথাটা। নাকের ভেতর অক্সিজেনের পাইপ, হাতের শিরায় টিউব, চাদরের নিচে থেকেও একাধিক পাইপ বেরিয়ে এসেছে। একসময় শরীরটা পেশীবহুল ছিল, এখন সেটা নরম কাদার মতো তুলতুলে। এগিয়ে এসে রানার কাঁধে একটা হাত রাখল একজন ডাক্তার।

'অ্যাডমিরাল কথা বলতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

মাথাটা সামান্য একটু ঘোরালেন অ্যাডমিরাল স্কট, একটা দুর্বল হাত তুলে রানার উদ্দেশে নাড়লেন। 'কাছে আসুন··· মিঃ রানা,' বিড় বিড় করে বললেন তিনি।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ডাক্তার। 'কাছে পিঠেই আছি আমি, দরকার হলে ডাকবেন,' কথাটা বলে ঘুরে দাঁড়াল সে। ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আবার।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বিছানার পাশে বসল রানা। তারপর ঝুঁকে পড়ল অ্যাডমিরাল স্কটের কানের দিকে। 'কুইক-ডেথ প্রজেক্টাইল,' বলল রানা। 'আকাশে ওঠার পর কিভাবে সেটা অপারেট করে?'

'সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স···রাইফ্লিঙ।'

'বুঝেছি,' নিচু গলায় বলল রানা। 'গান বোরের ভেতর স্পাইরাল রাইফ্লিঙের ফলে শেলটা ঘুরতে শুরু করে, সেই সাথে একটা সেন্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্স সেট হয়ে যায়···'

'জেনারেটর চালু হয়···ফলে ছোটো একটা রাডার অলটিমিটার স্টার্ট নেয়···'

'আপনি নিশ্চয়ই একটা ব্যারোমেট্রিক অলটিমিটারের কথা বলতে চাইছেন?'

'না··ব্যারোমেট্রিকে কাজ হবে না,' ফিসফিস করছেন অ্যাডমিরাল স্কট। 'হেভী ন্যাভাল শেলের রয়েছে হাই ভেলোসিটি আর ফ্ল্যাট ট্রাজেকটরি···নিখুঁত ব্যারোমেট্রিক রিডিঙের জন্যে বড় বেশি নিচু···মানে, মাস্ট ইউজ রাডার টু বাউন্স সিগ-

ন্যাল ফ্রম গ্রাউণ্ড।'

'কিন্তু কামান যখন দাগা হবে,' বলল রানা, 'একটা রাডার অলটিমিটার হাই গ্রাউণ্ড ফোর্স সহ্য করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

অনেক কষ্টে ক্ষীণ একটু হাসলেন অ্যাডমিরাল স্কট। 'প্যাকেজের ডিজাইন নিজের হাতে তৈরি করেছি আমি। নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করুন…পাউডার চার্জ ডিটোনেট হবার সবটুকু ধকল সহ্য করতে পারবে ইন্সট্রুমেন্টগুলো।'

প্রচণ্ড ক্লান্তিতে চোখ বুঁজলেন অ্যাডমিরাল। এই সময় নিঃশব্দে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল হিলি। রানার কাঁধে একটা হাত রাখল সে। ফিসফিস করে বলল, 'আপনার কথা শেষ হয়েছে?'

'না।'

'আপনি নাহয় পরে আর একবার…বিকেলের দিকে আসুন।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা, 'অনেক বেশি দেরি হয়ে যাবে।'

রেগে গেল হিলি। চাপা গলায় বলল, 'বাবাকে আপনি মেরে ফেলতে চান?' দু'চোখ বেয়ে পানি নেমে আসছে।

উত্তর দিল না রানা। কিন্তু যেমন ঝুঁকে ছিল তেমনি রইল, সিধে হয়ে দাঁড়াবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না ওর মধ্যে। 'প্লীজ, মিঃ রানা, দোহাই আপনার…'

হিলি কি বলছে, শুনতেই পাচ্ছে না রানা। অ্যাডমিরাল স্কট ওর একটা হাত ধরেছেন। ধীরে ধীরে চোখ মেলছেন তিনি। 'একটু সামলে নিচ্ছি…যাবেন না, এটা আমার অর্ডার।'

রানার চেহারায় ব্যথা আর সহানুভূতির ছাপ দেখে পিছিয়ে গেল হিলি।

'এরপর কি ঘটবে?' নিচু গলায় প্রশ্ন করল রানা।

'শেলটা তার ক্ষমতার শীর্ষে ওঠার পর নামতে শুরু করবে মাটির দিকে, অলটিমিটারের ওমনিডিরেকশন্যাল ইণ্ডিকেটর পতনের গতি আর মাত্রা দেখিয়ে সিগন্যাল দিতে শুরু করবে···

ক্রমশঃ নিস্তেজ হতে হতে মিলিয়ে গেল অ্যাডমিরালের গলার আওয়াজ। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে রানা।

'মাটি থেকে পনেরশো ফিট ওপরে থাকতে একটা প্যারাস্যুট খুলে যাবে, ফলে মন্থর হয়ে পড়বে শেল পতনের গতি, সেই সাথে চালু হবে ছোটো একটা এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস।'

'পনেরোশো ফিট, প্যারাস্যুট খুলবে,' পুনরাবৃত্তি করল রানা।

'একহাজার ফিটের মাথায় এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস ডিটোনেট করবে···প্রজেক্টাইলের মাথা ভেঙে বেরিয়ে আসবে একগাদা ক্ষুদে বোমা, কুইক-ডেথ ভর্তি···'

চেয়ারে হেলান দিল রানা। প্রজেক্টাইল অপারেশনের বর্ণনাটা মনে গেঁথে নেবার চেষ্টা করছে। অ্যাডমিরালের ঢুলুঢুলু চোখের দিকে তাকাল আবার।

'সময়ের হিসেবটা, অ্যাডমিরাল? প্যারাস্যুট ইজেকশন আর কুইক-ডেথ ভর্তি বোমা বেরিয়ে আসার মাঝখানে সময়ের ব্যবধান কতো···?'

'অনেক দিন আগের কথা, মনে নেই···

'চেষ্টা করুন, প্লীজ,' চাপা গলায় আবেদন জানাল রানা।

তলিয়ে যাচ্ছেন অ্যাডমিরাল। সচেতন থাকার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন তিনি, কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না তাঁর ব্রেনের সেল। পরমুহূর্তে ঢিল পড়ল মুখের ভাঁজে, ফিসফিস করে বললেন, 'মনে হয়...ঠিক জানি না...ত্রিশ সেকেণ্ড...পতনের মাত্রা প্রতি সেকেণ্ডে আঠারো ফিট...'

'ত্রিশ সেকেণ্ড?' জানতে চাইল রানা, নিশ্চিত হতে চাইছে ও।

রানার কব্জি ধরে থাকা অ্যাডমিরালের হাতটা নেতিয়ে পড়ল বিছানায়, বন্ধ হয়ে গেল চোখ দুটো। জ্ঞান হারিয়েছেন তিনি।

মলি বেণ্ডারের সাথে সংঘর্ষে আইওয়ার কোনো ক্ষতি হয়নি, শুধু বো-এর রঙ একটু চটে গেছে। মৃদু একটু ঝাঁকিও অনুভব করেনি কবীর চৌধুরী। পোর্টের দিকে হুইল ঘোরালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটা অবশ্যই এড়াতে পারত সে, কিন্তু তাতে চ্যানেলের গভীর এলাকা থেকে অল্প পানিতে সরিয়ে নিয়ে আসতে হতো আইওয়াকে, তার ফলে জাহাজের কীলের সাথে নদীর মেঝে ঘষা খেতে পারত—ঝুঁকিটা নিতে চায়নি সে।

এমনিতেই প্রতি মুহূর্তে ঝুঁকি নিতে হচ্ছে তাকে। হাজার হাজার টন অপ্রয়োজনীয় লোহা আর ইস্পাত ভেঙে ফেলে দিয়ে ব্যাটলশিপের ওয়াটারলাইন আটত্রিশ ফিট থেকে কমিয়ে বাইশ ফিটে নামিয়ে এনেছে সে, তবু নদীর মেঝে আর আইওয়ার কীলের মাঝখানে অতি সামান্য ফাঁক থাকছে। যে-কোনো মুহূর্তে মাটিতে আটকে যেতে পারে জাহাজ। পিছনে কয়েক মাইল লম্বা

ঘোলা পানি রেখে এগোচ্ছে আইওয়া। নরম কাদায় আটকাচ্ছে না কীল, কিন্তু কাদার ঠিক নিচেই রয়েছে শক্ত মাটি, একবার যদি বেকায়দায় পড়ে আটকে যায়, সমস্ত আয়োজন পণ্ড হয়ে যাবে।

এই নদীতে বারবার আসা-যাওয়া করেছে কবীর চৌধুরী। এর প্রতিটি ইঞ্চি তার নখদর্পণে। প্রতিটি বয়া, প্রতিটি ডোবা চর, প্রতি গজে নদীর মেঝে কোথায় কতোটুকু উঁচু-নিচু সব তার মুখস্থ। কঠোর পরিশ্রম করে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছে সে, এখন সেগুলো সুফলও দিচ্ছে।

সামনে রয়েছে আসল বিপদ। কেটলী বটম নামে একটা চর আছে, পানিতে ডোবা। লম্বায় সেটা ছয় মাইল। উঁচু-নিচু বালির অসংখ্য চড়া গোটা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। নোঙর কেটে রওনা হবার পর থেকেই এই চরের কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ করছে কবীর চৌধুরী।

পিছিয়ে এসে মাইক্রোফোনের মাউথ-পীসটা তুলে নিল কবীর চৌধুরী। 'বিরতিহীন ডেপথ রিডিং চাই আমি।'

স্পীকারের মাধ্যমে একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন।'

তিন ডেক নিচে কবীর চৌধুরীর দু'জন নিগ্রো ক্রু পালা করে ডেপথ রিডিং আওড়াবার দায়িত্ব নিল। ফ্যাদোমিটার দেখে রিপোর্ট করছে তারা। সাধারণতঃ ফ্যাদমের হিসেবে রিডিং জানানো হয়, কিন্তু তারা ফিটের হিসেবে জানাচ্ছে।

'টোয়েন্টি সিক্স ফিট··· টোয়েন্টি-ফাইভ··· টোয়েন্টি-ফোর-ফাইভ।'

কেটলী বটম তার উপস্থিতি জাহির করছে। 'যাও, হেলিকপ্টার রেডি করো,' একজন সহকারীকে আদেশ করল কবীর চৌধুরী। কিছু তথ্য তার দরকার। রানা সম্পর্কে।

ব্যাটলশিপ আইওয়ার ইঞ্জিন রুম।

এতো বড় একটা জাহাজকে মাত্র সত্তর জন ক্রু দিয়ে চালানো প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। প্রতিটি ক্রু একা পাঁচজনের সমান কাজ করছে। প্রচণ্ড মানসিক উত্তেজনা আর অমানুষিক কায়িক পরিশ্রমে চেহারা বদলে গেছে ক্রুদের। দরদর করে ঘামছে সবাই, রক্ত-মাংসের হাত-পায়ে যান্ত্রিক ব্যস্ততা। দুটো ইঞ্জিন সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে তবু কিছুটা রক্ষা পেয়েছে ওরা। কিন্তু সবচেয়ে অস্বস্তিকর ব্যাপার, ওদের মধ্যে অনেককেই ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে যখন সময় আসবে, গানারের ভূমিকাও পালন করতে হবে।

তবে এতো পরিশ্রম গায়ে লাগছে না ওদের, তার কারণ এই ছুটকো কাজে আশাতীত মজুরী দেয়া হবে ওদেরকে। জাহাজ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বেকার বসে ছিল ওরা গ্রীসের একটা বন্দরে। এই সময় হঠাৎ একটা রাশান ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপ্টেনের তরফ থেকে প্রস্তাবটা এলো। একটা সাবমেরিন আর একটা ব্যাটলশিপের জন্যে কিছু ক্রু দরকার। সাধারণতঃ যা দেয়া হয় তার চারগুণ বেশি পারিশ্রমিক, খাওয়া-দাওয়া সহ অন্যান্য যাবতীয় খরচ সব বহন করবে কর্তৃপক্ষ। এক কথায় রাজি হয়ে গেছে ওরা। পরদিনই প্লেনে করে নিয়ে আসা হয়েছে ওদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

ভিসা ইত্যাদির ঝামেলা সবই সামলেছে নতুন কর্তৃপক্ষ।

অন্ধের মতো কাজ করছে ওরা, খোলের স্টীল প্লেটের অপর-দিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই জানে না। জানে না আইওয়া তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, বা এই অভিযান তাদের জন্যে কি পরিণাম ডেকে আনতে যাচ্ছে। কবীর চৌধুরী তাদেরকে জানিয়েছে, পুরানো ইঞ্জিনগুলো এখনো কি পরিমাণ কর্মক্ষম আছে জানার জন্যে খানিক দূরে যাবে আইওয়া, সেই সাথে গোলা ছুঁড়ে কামানগুলোকেও পরীক্ষা করে নেয়া হবে। ক্রুরা ধরে নিয়েছে বে থেকে বেরিয়ে আটলান্টিকে পড়বে জাহাজ। সে-জন্যেই জাহাজটা হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেয়ে দুলে ওঠায় হতভম্ব হয়ে গেল তারা। খোলের নিচের দিক থেকে কর্কশ ধাতব আওয়াজ উঠে আসছে, থরথর করে কাঁপছে জাহাজের প্রতিটি নাট-বল্টু।

বালির একটা চরের সাথে ধাক্কা খেয়েছে আইওয়া। বালির ঢিবিটাকে দু'ফাঁক করে দিয়ে এখনও এগোচ্ছে জাহাজ, কিন্তু অস্বাভাবিক মন্থর হয়ে গেছে তার গতি। ব্রিজ থেকে টেলি-গ্রাফের মাধ্যমে নির্দেশ এলো, 'ফুল অ্যাহেড!' জাহাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ইঞ্জিনগুলো এক লক্ষ ছয় হাজার হর্স পাওয়ার প্রয়োগ করছে।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে ক্রুরা, উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাদে-রকে। ওদের প্রত্যেকের ধারণা ছিল, গভীর পানিতে চলে এসেছে আইওয়া।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার চার্লস ব্রিজের সাথে যোগাযোগ করল।

'ক্যাপ্টেন, আমরা কি মাটির সাথে ধাক্কা খেয়েছি ?'

'তেমন কিছু নয়, চার্টে উল্লেখ করা হয়নি এমন একটা কিছুর সাথে ঘষা খেয়েছে জাহাজ,' শান্ত গলায় আশ্বাস দিল কবীর চৌধুরী। 'বাধাটা না পেরোনো পর্যন্ত ফুল অ্যাহেড নির্দেশ বলবৎ থাকল।'

কিন্তু চীফ ইঞ্জিনিয়ার চার্লসের সন্দেহ ঘোচে না। প্রায় থেমে গেছে জাহাজ, চলছে কিনা বোঝা মুশকিল। থরথর করে কাঁপছে পায়ের নিচের ডেক। আর কর্কশ ধাতব শব্দের কোনো বিরাম নাই। তবে, খানিক পর থেকে ধীরে ধীরে কাঁপুনিটা কমে আসতে শুরু করল। ক্রমশঃ গতি বাড়ছে আবার। আবার যেন গভীর পানিতে চলে এসেছে আইওয়া।

এক মিনিট পর ব্রিজ থেকে চিৎকার করে বলল কবীর চৌধুরী, 'তোমার কর্মীদেরকে বলো, ছাড়া পেয়েছি আমরা। বেরিয়ে এসেছি গভীর পানিতে।'

ক্রুদের চেহারা থেকে ধীরে ধীরে দিশেহারা ভাবটা দূর হয়ে গেল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ক্ষীণ একটু হাসল কেউ কেউ। তারপর আবার যে যার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হোয়াইট হাউস। মাটির তিনশো ফিট নিচে ইমার্জেন্সী এক্সিকিউটিভ অফিস এলাকা। কনফারেন্স রুম।

লম্বা কনফারেন্স টেবিলের শেষ প্রান্তে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছেন প্রেসিডেন্ট। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে ডেভিড মরগানের চোখের ওপর। 'ব্যাপারটা কি, মরগান? হঠাৎ এমন

কি ঘটল যে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে না? জুজুর ভয়ে দিশেহারা হবার মতো মানুষ তো তুমি নও, অন্ততঃ সেই রকম ধারণা ছিল আমার। আমি ক্লান্ত, বিশ্রামের জন্যে রাজধানী ছেড়ে চলে যাচ্ছি কাল, নিশ্চয়ই সে-খবর জানা আছে তোমার?'

নার্ভাস বোধ করছেন মরগান। প্রেসিডেন্ট তাঁর কড়া মেজাজের জন্যে বিখ্যাত। কিন্তু কথা বলার সময় কোনোরকম অপ্রতিভ ভাব দেখা গেল না তাঁর মধ্যে।

'দুঃখিত, স্যার,' বললেন মরগান। 'আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করার কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু এমন একটা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, এ ছাড়া কোনো উপায় দেখতে পাইনি আমি। জয়েন্ট চীফসকে আমি জানিয়েছি·

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ডিফেন্স সেক্রেটারী চার্লস উইলসন বললেন, 'মরগান বলতে চাইছে···

বাধা দিয়ে মরগান বললেন, 'আমি বলতে চাইছি, চেসাপীক বে-র কোথাও এক পাগলা বিজ্ঞানী একটা বায়োলজিক্যাল মারণাস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে। এখন থেকে যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো বড় একটা শহরে সেই মহামারীর বীজ ভর্তি একটা শেল ফাটিয়ে দিতে পারে সে। শহরটার প্রতিটি প্রাণী মারা যাবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই, গোটা যুক্তরাষ্ট্রের সবাই মারা যাবে কয়েক দিনের মধ্যে, শুধু তাই নয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী গোটা উত্তর আমেরিকায় প্রাণের কোনো চিহ্ন দেখতে পাবে না কেউ।'

জেনারেল কার্ট হিগিনস, চেয়ারম্যান অব দি জয়েন্ট চীফস,

মরগানের দিকে তীব্র সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন। 'ওরকম কিলিং পাওয়ার আছে এমন কোনো বায়োলজিক্যাল অস্ত্রের কথা জানা নেই আমার। আপনার মাথার কোনরকম···'

চটেমটে কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন মরগান, কিন্তু একটা হাত তুলে, থামার ইঙ্গিত করলেন প্রেসিডেন্ট।

'শান্ত হও, মরগান,' প্রেসিডেন্টের ঘন গোঁফের নিচে সকৌতুক একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। সহকর্মীরা নিজেদের মধ্যে বাক-যুদ্ধ শুরু করলে মনে মনে খুশিই হন তিনি, মাঝে মধ্যে সেটা উপভোগও করেন। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্য রকম, বুঝতে পারছেন তিনি। সমস্যাটা জেনে নিয়ে ত্বরিত ব্যবস্থা নেবার দরকার হতে পারে।

চেয়ারে হেলান দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'আপাততঃ আমার পরামর্শ, মরগানের কথাগুলো বাইবেল বলে মনে করা হোক।' চীফস অব ন্যাভাল অপারেশনস্ অ্যাডমিরাল টিমোথি মার্চের দিকে তাকালেন তিনি। 'মার্চ, ব্যাপারটা যখন নৌ-হামলা সংক্রান্ত, কাজেই তোমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই আমি।'

চেহারা দেখে বোঝাই যায় না টিমোথি মার্চ একজন জাঁদরেল সামরিক নেতা। মাথায় সাদা চুলের মুকুট, সরু মুখটা ক্লিন শেভ, চোখে স্টীল রিমের চশমা, নিরীহ একজন সেলসম্যানের মতো চেহারা। মরগানের সাথে কথা বলার সময় কিছু নোট নিয়েছেন তিনি, চোখ নামিয়ে সেটা একবার দেখে নিয়ে শুরু করলেন।

'তুটো তথ্য জানা আছে আমার, যাতে প্রমাণ হয় মরগানের

আশংকা অমূলক। এক, ব্যাটলশিপ আইওয়াকে ওয়ালভিস বে ইনভেস্টমেন্টের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। আমাদের গত-কালকের স্যাটেলাইট ছবিতে দেখা গেছে ফর্বস্ শিপইয়ার্ডে নোঙর ফেলা অবস্থায় ছিল আইওয়া।'

'এখন ? এই মুহূর্তে ?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

উত্তর দিলেন না মার্চ, টেবিলে তাঁর সামনের একটা বোতামে চাপ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দূর দেয়ালে কাঠের প্যানেল দু'ভাগ হয়ে সরে গেল দু'পাশে, আট বাই দশ ফুটের একটা প্রজেকশন স্ক্রীন দেখা যাচ্ছে সেখানে। টেলিফোনের একটা রিসিভার তুলে নিয়ে দ্রুত গলায় নির্দেশ দিলেন মার্চ, 'শুরু করো।'

মাটির অনেক ওপর থেকে তোলা ছবি ফুটে উঠল স্ক্রীনে। স্যাটেলাইটের অত্যন্ত শক্তিশালী ক্যামেরায় শেষ রাতের অন্ধ-কার আর মেঘ প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। ভিউকার্ডের মতো উজ্জ্বল আর ঝকঝকে দেখাচ্ছে চেসাপীক বে-র পুব তীরের ছবি। এগিয়ে গিয়ে স্ক্রীনের পাশে দাঁড়ালেন মার্চ, হাতে পেন্সিল দিয়ে ছবির একটা জায়গা চিহ্নিত করলেন।

'এই যে, এখানে এটা প জেন্ট নদীর প্রবেশ মুখ আর অব-বাহিকা, উত্তরে ড্রাম পয়েন্ট আর দক্ষিণে হগ পয়েন্ট,' পেন্সিলটা মুহূর্তের জন্যে স্থির হলো, 'আর এই ক্ষুদে রেখাগুলো ফর্বস শিপ-ইয়ার্ডের ডক···মরগানের পক্ষে একটা প্রমাণ। দেখতেই পাচ্ছেন, মিঃ প্রেসিডেন্ট, আইওয়ার ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও।'

মার্চের নির্দেশে ক্যামেরা এগিয়ে যাচ্ছে বে-র আরেক

প্রান্তের দিকে। মালবাহী জাহাজ, মাছ ধরার বোট, মিসাইল-বাহী ফ্রিগেট মিছিল করে পিছিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এসবের মধ্যে ব্যাটলশিপের মতো বিশালাকার কোনো আকৃতি দেখা যাচ্ছে না। স্ক্রীনের ডান দিকে ক্যামব্রিজ। একটু পরেই বাঁ দিকে দেখা গেল ন্যাভাল একাডেমি। তারপর স্যাণ্ডি পয়েন্টের নিচে টোল ব্রিজ। ক্যামেরা এগিয়ে যাচ্ছে সেই একেবারে প্যাটাপসকো নদী পর্যন্ত। তারপর বালটিমোর। নেই।

'দক্ষিণে?' মৃদু গলায় জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'নরফোক ছাড়া তিনশো মাইলের মধ্যে আর কোনো শহর নেই।'

'কিন্তু...তাহলে? অতো বড় একটা জাহাজ বাতাসে তো আর মিলিয়ে যেতে পারে না!'

কেউ কোনো উত্তর দেবার আগে হোয়াইট হাউসের একজন এইড কনফারেন্স রূমে ঢুকল, সোজা এগিয়ে এসে প্রেসিডেন্টের সামনে একটা কাগজ রাখল সে। কাগজটা দেখেই চিনতে পারছে সবাই রেডিও মেসেজের অনুলিপি।

'কবীর চৌধুরীর মেসেজ!' কাগজের দিকে ভুরু কুঁচকে আছেন প্রেসিডেন্ট। হঠাৎ মুখ তুলে মরগানের দিকে তাকালেন একবার। 'কবীর চৌধুরী? কে সে?' পরমুহূর্তে আবার চোখ নামালেন রেডিও মেসেজের দিকে। '...আমি, কবীর চৌধুরী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেইনল্যাণ্ড আক্রমণ করতে যাচ্ছি। বড় বাড় বেড়েছ তোমরা, তাই আমার দশ বিলিয়ন ডলারের চেকটা আটকে দেবার দুঃসাহস দেখিয়েছ, আমার গবেষণাগার ধ্বংস করে

দিয়েছ। এটা তারই প্রতিশোধ। কবীর চৌধুরীকে ক্ষেপিয়ে তোলার পরিণাম কি হতে পারে, তার সামান্য একটু নমুনা দেখাতে চাই আমি তুনিয়াকে।' ঝট্ করে মুখ তুললেন প্রেসিডেণ্ট। 'এসব কি ? কবীর চৌধুরী···কে সে ?'

'এর কথাই বলতে চেয়েছি আমি,' অস্বাভাবিক শান্ত গলায় বললেন মরগান। 'পাগলা বিজ্ঞানী।'

রেডিও মেসেজটার দিকে আবার তাকালেন প্রেসিডেণ্ট। শব্দগুলো যেন তাঁর চোখের সামনে নাচছে, কথাগুলোর অর্থ বুঝতে গিয়ে ঘেমে উঠছেন তিনি। বাস্তব বিপদের চেহারা কল্পনা করে ঢোক গিললেন একটা। 'তার মানে আমাদের মাথার ওপর নরক ভেঙে পড়তে যাচ্ছে ?'

ছয়

ওয়াশিংটন ন্যাশন্যাল এয়ারপোর্ট। নুমার নিজস্ব হ্যাঙ্গার।

একটা ড্রাফটিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। টেবিলের ওদিকে কর্ণেল রেজনিক আর রানা। এলাকার জলপথ আঁকা একটা লার্জ-স্কেল ম্যাপ দেখছে ওরা।

'ওজন কমিয়ে আইওয়াকে হালকা করার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে কবীর চৌধুরীর,' অ্যাডমিরালের চুরুটে আগুন ধরিয়ে দিয়ে লাইটারটা পকেটে ভরল রানা। 'ষোল ফুট ওয়াটার লাইন নামানো সহজ কথা নয়। হাজার হাজার টন ইস্পাত ভেঙে ফেলে দিতে হয়েছে তাকে। উদ্দেশ্য ছাড়া একটা কাজও করে না সে।'

'তোমার হিসেবে কোনো গোলমাল নেই তো?' জর্জ হ্যামিলটন জানতে চাইলেন। 'তার মানে পানির নিচে বাইশ ফিট ডুবে আছে আইওয়া।' এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি।

'অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার।'

'এমন একজন লোকের কাছ থেকে জেনেছি, যার ভুল হতে পারে না,' বলল রানা। 'ফর্বস শিপইয়ার্ডের সুপারিনটেনডেন্ট ডেল জারভিসের সাথে আবার যোগাযোগ করেছিলাম আমি। হিসাবটা নিখুঁত বলে গ্যারান্টি দিয়েছে সে।'

'কিন্তু কেন?' জানতে চাইল কর্ণেল রেজনিক। 'কি লাভ তাতে? সমস্ত কামান সরিয়ে সেগুলোর জায়গায় ডামি বসানো হয়ে থাকলে জাহাজটার আর মূল্য থাকলো কোথায়? কি কাজে লাগাবে ওটাকে কবীর চৌধুরী?'

'সমস্ত ফায়ার-কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট সহ দু'নম্বর গান টাওয়ারটা এখনো নিজের জায়গায় আছে,' বলল রানা।

এই সময় হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দ। হ্যাঙ্গারের বাইরে ঘ্যাচ্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক ধাক্কায় দরজা খুলে দ্রুত বেরিয়ে এলো নীল স্কার্ট আর সাদা ব্লাউজ পরা একটা মেয়ে। হনহন করে ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে মেয়েটা। চিনতে পারছে ওরা, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের পার্সোনাল সেক্রেটারী, মেরিলিন। সোজা এগিয়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল সে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে।

'কি ব্যাপার, মেরিলিন?' আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'আমাদের অফিসে একটা রেডিও মেসেজ এসেছে, স্যার,' দ্রুত বলল মেরিলিন। 'মিঃ রানার নামে। কবীর চৌধুরীর মেসেজ।' হাতের ব্যাগ খুলে মেসেজের একটা অনুলিপি বের

করল সে। 'এই যে…

মেরিলিনের কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল না রানা, টেবিলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ছোঁ মেরে কেড়ে নিল অনুলিপিটা। পড়ছে।

মুহূর্তে বদলে গেল রানার চেহারা। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন উঠে এসেছে মুখে। কাগজ ধরা হাতটা মুঠো পাকিয়ে গেল, ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল ও।

'কি ব্যাপার, রানা?'

'নষ্ট করার মতো সময় নেই আর, অ্যাডমিরাল,' দ্রুত বলল রানা। 'প্রতিটি সেকেণ্ড এখন মহামূল্যবান। ট্রুথ সেরাম ব্যবহার করে অ্যাডমিরাল ডেনটন স্কটের কাছ থেকে কুইক-ডেথের রহস্য জেনে নিয়েছে কবীর চৌধুরী। চ্যালেঞ্জ করে বলেছে, দুনিয়ার এমন কোনো শক্তি নেই যে তাকে ঠেকাতে পারে এখন। গোটা উত্তর আমেরিকাকে ধ্বংস করে দিতে যাচ্ছে সে।' হঠাৎ থেমে গেল রানা, কথা বলতে পারছে না।

দ্রুত টেবিল ঘুরে এগিয়ে এসে ওর কাঁধে একটা হাত রাখলেন হ্যামিলটন।

'আমার প্ল্যানটাই এখন একমাত্র উপায়, অ্যাডমিরাল,' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই আমি।'

মনোযোগের সাথে একটা নতুন চুরুট ধরালেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। সিলিংয়ের দিকে একমুখ নীলচে ধোঁয়া ছেড়ে রানার দিকে তাকালেন। 'তোমার প্ল্যানটা পাগলামি ছাড়া কিছুই নয়, রানা। তুমি আত্মহত্যা করতে চাইছ।'

'কিছু একটা করতে চাইছি,' দৃঢ় গলায় বলল রানা, 'এখানে এভাবে বসে কথার মালা গাঁথলে কোনো লাভ হবে? বুঝতে চেষ্টা করুন, অ্যাডমিরাল। সামরিক উপদেষ্টারা প্রেসিডেন্টকে রাজি করাবেন, কমাণ্ডো পাঠিয়ে আইওয়া দখল করার নির্দেশ দেবেন তিনি। মহামারীর বীজ সামরিক বাহিনীর হাতে চলে আসবে। আপনি তাই চান?'

'আগেও জানিয়েছি, নীতিগতভাবে আমি তা চাই না,' বল-লেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'কিন্তু আমার প্রশ্ন, কণ্ট্রোল করা যায় না এমন একটা বায়োলজিক্যাল অস্ত্র কি কাজে লাগবে ওদের?'

'প্রাণ বাজি রেখে বলতে পারি, এ-দেশের সব ক'জন বায়ো-লজিস্ট কুইক-ডেথের প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবে।' সিগারেট ধরাচ্ছে রানা, হাত দুটো মৃদু মৃদু কাঁপছে দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল। 'আজ হোক কাল হোক, কেউ একজন দুর্লঙ্ঘ্য বাধাটা টপকাবে, কুইক-ডেথকে কণ্ট্রোল করা তখন আর কোনো সমস্যা হবে না—এবং আতংক-গ্রস্ত একজন জেনারেল বা একজন অ্যাডমিরাল হঠাৎ একদিন কারো বিরুদ্ধে তা ব্যবহারও করে বসবে।'

'কুইক-ডেথের অস্তিত্ব পর্যন্ত রাখতে চাইছ না তুমি,' চোখ বুঁজে ওপর-নিচে মাথা দোলালেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'আমি তোমাকে সমর্থন করি। কিন্তু···

'আপনারা আমার বিরোধিতা করলেও,' দৃঢ় স্বরে বলল রানা, 'কবীর চৌধুরীকে বাধা দেবার জন্যে পদক্ষেপ নিতে হবে

আমাকে।'

'কিন্তু এখানে আমরা যে তিনজন রয়েছি, তারা কেউ ঢুটো কুইক-ডেথ উদ্ধার করার প্রতিযোগিতায় ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের সাথে পেরে উঠব না।'

'পারব কি পারব না সেটা পরের কথা,' বলল রানা। 'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? এখনকার পরিস্থিতি অ্যাকশন দাবী করছে।' একটু বিরতি নিয়ে আবার শুরু করল রানা, 'ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের আগে আমরা যদি একজন লোককে আইওয়াতে পাঠাতে পারি, তার পক্ষে প্রজেক্টাইল ঢুটোর ফায়ারিং মেকানিজম অচল করে দিয়ে কুইক-ডেথ ভর্তি ক্ষুদে বোমাগুলো পানিতে ফেলে দেয়া খুব কঠিন হবে না।'

'সেই লোকটা নিশ্চয়ই তুমি?' গম্ভীর গলায় জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'তিনজনের মধ্যে আমিই সবচেয়ে উপযুক্ত।'

'আপনি আমাকে ছোটো করে দেখছেন, মিঃ রানা,' গম্ভীর গলায় বলল কর্ণেল রেজনিক।

'সব চেষ্টা যদি বিফল হয়,' বলল রানা, 'হেলিকপ্টার কন্ট্রোল করার জন্যে ভালো একজন লোক দরকার হবে আমাদের। দুঃখিত, কর্ণেল, আমি হেলিকপ্টার চালাতে জানি না, কাজেই আমাকেই যেতে হচ্ছে আইওয়াতে।'

'তাছাড়া, ঠিক এ-ধরনের কাজে আপনার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, কর্ণেল,' মন্তব্য করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'এটা একটা ইমার্জেন্সি, ব্যক্তিগতভাবে আমি একজন প্রফে-

শন্যালের ওপর দায়িত্ব দিতে চাই।' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'কিন্তু তবু ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে ব্যাপারটা। তোমার আগেই যদি ডিফেন্সের লোকেরা আইওয়ায় গিয়ে ওঠে, সব ভেস্তে যাবে। আইওয়া কোথায় আছে তা খুঁজে বের করতে মোটেও বেগ পেতে হবে না ওদেরকে। স্যাটেলাইটের সাহায্য পাচ্ছে ওরা।'

'আর আমরা সাহায্য পাচ্ছি আগেভাগে যোগাড় করা তথ্যের সাহায্য,' বলল রানা।

'তার মানে?'

'আমি জানি আইওয়া কোন্ দিকে যাচ্ছে,' মৃদু গলায় বলল রানা।

'জানেন?'

'কোন্ দিকে?' আগ্রহের আতিশয্যে রানার দিকে ঝুঁকে পড়লেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'আইওয়ার ওজন কমিয়েই ধরা পড়ে গেছে কবীর চৌধুরী,' বলল রানা। 'একটা মাত্র জলপথ আছে যার গভীরতা গড়পরতায় বাইশ ফিটের মতো। ব্যাটলশিপ আইওয়াও পানির নিচে মাত্র বাইশ ফিট ডুবে আছে, ঠিক কিনা?'

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন রানার দিকে। কর্ণেল রেজনিকও একচুল নড়ছে না। দু'জনেই অপেক্ষা করছে ধাঁধার উত্তরটা রানার মুখ থেকে শোনার জন্যে।

'রাজধানী,' দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলল রানা। 'কবীর চৌধুরী

পোটোম্যাক নদী দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আইওয়াকে। ওয়াশিংটন আক্রমণ করবে সে।'

মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল বাতাসে উড়ছে কবীর চৌধুরীর। চোখে ক্ষুরধার দৃষ্টি, তাকিয়ে আছে বহুদূরে। হুইল ধরা হাত দুটো টনটন করছে ব্যথায়, প্রচণ্ড কায়িক পরিশ্রমে ফর্সা মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, অনবরত দরদর করে ঘামছে সে, টপ-টপ করে পড়ছে ফোঁটাগুলো পায়ের কাছে। শুধু হাত দুটো নড়ছে তার, তাছাড়া শরীরটা ব্রোঞ্জের তৈরি মূর্তির মতো স্থির। একটানা প্রায় আট ঘণ্টা আইওয়ার হুইলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। মাঝখানে দু'ঘণ্টার জন্যে একাই হেলিকপ্টার নিয়ে জাহাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ফিরে এসে সেই যে দাঁড়িয়েছে, মুহূর্তের জন্যেও নড়েনি আর। হাতে ফোস্কা পড়েছে, সেগুলো গলে গিয়ে জ্বালা করছে। কিন্তু এসব দিকে কোনো খেয়াল নেই তার। কোনো জীবিত বা মৃত নাবিক দুঃস্বপ্নেও যা ভাবতে পারে না, তাই করছে সে, একটা ব্যাটলশিপকে নিরাপদে নিয়ে যাচ্ছে চ্যানেলের ভেতর দিয়ে। এই কাজেই সে তার সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিয়েছে। দু'নম্বর গান টাওয়ারের লম্বা, ভয়ংকর কামান্-গুলো উজানের দিকে মুখ করে রয়েছে, এখনই রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে পেনসিলভানিয়া এভেনিউ।

চ্যানেল বয়াগুলোকে একের পর এক পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আইওয়া। বিশ মাইল সামনে ঝলমল করছে রাজধানী ওয়াশিংটনের আলোকমালা, সেদিকে সম্মোহিতের মতো এক-

দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কবীর চৌধুরী।

স্টার্নের পিছনে চলে গেল কোয়ানটিকো মেরিন বেস। হ্যালোয়িং পয়েন্ট আর গানস্টন কোভ পেরিয়ে এসেছে জাহাজ। আইওয়ার বো-এর সামনে এখন আর মাত্র একটাই বাঁক—তারপরই সরল রেখার মতো সোজা হয়ে গেছে চ্যানেল, শেষ হয়েছে গলফ্ কোর্সের কিনারায়, ইস্ট পোটোম্যাক পার্কে।

'টোয়েনটি-থ্রি ফিট,' ডেপথ রিডারের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো স্পিকারে। 'টোয়েনটি-থ্রি...টোয়েনটি-টু-ফাইভ...'

পরবর্তী বয়াকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আইওয়া। পাঁচ ব্লেডের আঠারো ফুট আউটবোর্ট প্রপেলার নদীর নিচে মহা আলোড়ন তুলছে, বো-এর ধাক্কা খেয়ে ফাইভ নট কারেন্টের পানি হয়ে উঠছে সাদা ফেনার পাহাড়।

'টোয়েনটি-টু ফিট, ক্যাপ্টেন,' ডেপথ রিডারের গলায় উত্তেজনা। 'টোয়েনটি-টু, আটকালো...আটকালো...হায় খোদা! টোয়েনটি-ওয়ান-ফাইভ!'

বালিশে হাতুড়ির বাড়ির মতো নদীর মেঝেতে গুতো মারল আইওয়া। ধাক্কাটা যতোটা না অনুভব করল তারচেয়ে বেশি অনুমান করে নিলো কবীর চৌধুরী—প্রতি মুহূর্তে গভীর কাদায় ঢুকে যাচ্ছে ব্যাটলশিপের বো। ইঞ্জিনগুলোর যান্ত্রিক গুঞ্জন থামেনি, থরথর করে কাঁপছে আইওয়া, কিন্তু গতি নেই, স্থির হয়ে গেছে।

মাউন্ট ভারননের ঢালের গায়ে আটকে গেছে আইওয়া।

'এ যে সম্ভব তা আমি ভাবতেই পারিনি,' বললেন অ্যাডমিরাল টিমোথি মার্চ। ভিউয়িং স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, দৃষ্টিতে বিস্ময় এবং প্রশংসা, আইওয়ার বিশাল আকার দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। 'এই রকম একটা ইস্পাতের দুর্গকে রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে সরু চ্যানেলের ভেতর দিয়ে চালিয়ে নব্বুই মাইল নিয়ে আসা, সীম্যানশিপের চরম ঔৎকর্ষ, সন্দেহ নেই।'

গভীর ধ্যানমগ্ন দেখাচ্ছে প্রেসিডেন্টকে। 'এই লোক, মানে, কবীর চৌধুরী সম্পর্কে কতোটুকু কি জানি আমরা?'

একজন এইডকে ইশারা করলেন মার্চ, এগিয়ে এসে প্রেসিডেন্টের সামনে একটা নীল রঙের ফোল্ডার বাড়িয়ে ধরল সে।

'আমার অনুরোধে রানা এজেন্সীর স্থানীয় চীফ···আনিস আহমেদ, কবীর চৌধুরী সম্পর্কে কিছু অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছে,' বললেন মার্চ। 'নতুন অনেক কথা জানতে পারছি আমরা, আমাদের সি. আই. এ.-র ফাইলে সেগুলো ছিল না।'

চোখে একজোড়া রিডিং গ্লাস পরে ফোল্ডারের ভাঁজ খুললেন প্রেসিডেন্ট। কয়েক মিনিট পর হর্ণ রিমের ওপর দিয়ে অ্যাডমিরাল মার্চের দিকে তাকালেন। 'অদ্ভুত ব্যাপার! গবেষণার বিষয় আর আবিষ্কার দেখে বোঝা যাচ্ছে, দুর্লভ একটা প্রতিভা। অথচ তার এই অধঃপতন? সম্ভবতঃ অবহেলার পরিণতি, অথবা···' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি।

'আইনের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নেই, বাকি সব ঠিক আছে,' বললেন ডেভিড মরগান। 'আর অবহেলার কথা বললেন, সেটাও

খাঁটি কথা। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো খাবার যোগাড় করতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে; বিজ্ঞানীদের কদর দেবে কোত্থেকে!'

ধীরে ধীরে সামরিক উপদেষ্টাদের দিকে ফিরলেন প্রেসিডেন্ট। 'আমি প্রস্তাব চাইছি।'

সবার আগে চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল কার্ট হিগিনস্। স্ক্রীনের পাশে গিয়ে টেবিলের দিকে ফিরলেন তিনি। 'আইওয়ায় ভয়ংকর একটা বায়োলজিক্যাল এজেন্ট রয়েছে, এই কথা মনে রেখে আমাদের স্টাফ প্ল্যানাররা কয়েকটা প্রোগ্রাম তৈরি করেছে। এক, এয়ারফোর্সের এফ-ওয়ান টোয়েনটি স্পেকটর জেটের একটা স্কোয়াড্রনকে কপারহেড মিসাইলের সাহায্যে আইওয়াকে উড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিতে পারি আমরা। এই আক্রমণকে সহায়তা করবে আর্মি ইউনিট, তীর থেকে ফায়ার ওপেন করে।'

'বড় বেশি ঝুঁকি,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'নিশ্চিত ফল পাবার আশা করা যায় না। আইওয়া যদি সেই মুহূর্তে এবং পুরোপুরি ধ্বংস না হয়, কুইক-ডেথের বীজ ছড়িয়ে পড়তে পারে।'

'দুই,' আবার শুরু করলেন হিগিনস্,' 'নেভী সীল (SEAL) এর একটা টিম পানিপথ দিয়ে আইওয়ায় চড়বে, ওদের কাজ হবে স্টার্ণ সেকশন দখল করা, ওখানে একটা হেলিপ্যাড আছে। সীল টিম সফল হলে মেরিন অ্যাসল্ট ট্রুপ ল্যাণ্ড করে দখল করতে পারবে আইওয়াকে।' থামলেন হিগিনস্, মন্তব্যের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

'কিন্তু জাহাজটাকে যদি ভেঙেচুরে সমতল করে ফেলা হয়ে

থাকে,' কথা বলছেন অ্যাডমিরাল টিমোথি মার্চ, 'মেরিন ট্রুপস্ ভেতরে ঢুকবে কিভাবে?'

উত্তর দিলেন মরগান। 'শিপইয়ার্ড সুপারিনটেনডেন্টের দেয়া তথ্য, আইওয়ার বেশিরভাগ আর্মার আর সুপারস্ট্রাকচার কাঠের সাথে বদল করা হয়েছে। বিস্ফোরণের সাহায্যে ভেতরে ঢুকতে পারবে ওরা, যদি ল্যাণ্ড করার সময়ই কবীর চৌধুরী ওদেরকে নিশ্চিহ্ন করে না দেয়।'

'এসব যদি ব্যর্থ হয়,' বললেন হিগিনস্, 'ক্ষুদে একটা নিউক্লিয়ার মিসাইলের সাহায্যে কাজ হাসিল করা আমাদের সর্বশেষ বিকল্প।'

কনফারেন্স রুমের ভেতর জমাট বাঁধছে স্তব্ধতা। ঝাড়া এক মিনিট কেউ কোনো শব্দ করলেন না। জেনারেলের সর্বশেষ প্রস্তাবের অকল্পনীয় পরিণতি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন সবাই। প্রস্তাবের সমর্থনে মুখ খুলতে সাহসী হলেন না কেউ। তবে, সমস্ত দায়িত্ব যার, তিনিই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙলেন।

'তার চেয়ে আমার মনে হয়,' বললেন প্রেসিডেন্ট, 'ছোটো একটা নিউট্রন বোমা সমস্যার সমাধান দিতে পারে।'

'শুধু রেডিওঅ্যাকটিভিটিতে মরবে না কিউ-ডি এজেন্ট,' জানালেন মরগান।

'এবং,' কথার পিঠে কথা পাড়লেন অ্যাডমিরাল মার্চ, 'মারাত্মক কোনো রশ্মিও বোধ হয় গান-টাওয়ার ভেদ করতে পারবে না। ছিপি আঁটা অবস্থায় প্রায় এয়ারটাইট থাকে ওগুলো।'

জেনারেল হিগিনসের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'নিউক্লি-

য়ার মিসাইল ব্যবহার করলে খারাপ কতোটুকু কি ঘটতে পারে আশা করি তোমার লোকেরা তা জানে ?’

অবিচলিত দেখাচ্ছে হিগিনসকে। ধীর ভঙ্গিতে ওপর-নিচে মাথা দোলালেন তিনি। ‘সেই চিরন্তন নীতি। অনেকের প্রাণ বাঁচাবার স্বার্থে কয়েকজনকে আত্মত্যাগ করতে হবে।’

‘ক’জনকে কয়েকজন বলছ তুমি ?’

‘পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর হাজার নিহত। সম্ভবতঃ এর দ্বিগুণ আহত হবে। আইওয়ার কাছাকাছি ছোটো জনবসতিগুলো আর আলেকজান্দ্রিয়ার ঘন-বসতি এলাকা সবচেয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতি-গ্রস্ত হবে। শহর ওয়াশিংটনের ব্যাপক কোনো ক্ষতি হবে না।’

‘রওনা হবার আগে তৈরি হতে কতোক্ষণ সময় নেবে মেরিন ট্রুপস্ ?’ জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

‘এই মুহূর্তে তারা হেলিকপ্টারে চড়ছে,’ এই প্রথম কথা বললেন মেরিন কমাণ্ড্যান্ট জেনারেল ম্যালকম। ‘আর এরই মধ্যে ভাটির দিকে একটা কোস্ট গার্ড পেট্রোল বোট নিয়ে রওনা হয়ে গেছে সীল।’

‘একটা করে কমব্যাট ইউনিটে দশজন করে লোক,’ যোগ করলেন মার্চ, ‘ভলান্টিয়ার ইউনিট।’

কির কির-কির কির, কির কির, কির কির, মৃদু শব্দে একটা বেল বেজে উঠল কেলাবেল হিগিনসের চেয়ারের পাশ থেকে। ঝুঁকে পড়ে অ্যাডমিরাল মার্চ তুলে নিলেন রিসিভারটা, শুনলেন, তারপর আবার রেখে দিলেন সেটা। মুখ তুলে হিগিনসের দিকে তাকালেন তিনি, হিগিনস্ স্ক্রীনের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

'আইওয়ার ওপর সাউদার্ণ ব্লাফে ক্যামেরা সেট করেছে কমিউনিকেশন টিম,' বললেন অ্যাডমিরাল মার্চ, 'কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ছবি পাঠাতে শুরু করবে ওরা।'

মার্চের কথা শেষ হবার আগেই স্যাটেলাইট ক্যামেরা অফ হয়ে গেল, মুহূর্তের জন্যে অন্ধকার হয়ে গেল স্ক্রীন, তারপরই নতুন ছবি ফুটে উঠল সেখানে। আইওয়ার সুপারস্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে একটা কাপে কফি ঢাললেন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু চুমুক দিচ্ছেন না তাতে। আইওয়ার দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন, উপযুক্ত একটা সিদ্ধান্ত খুঁজছেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত পর একটা নিঃশ্বাস ফেলে জেনারেল হিগিনসকে বললেন, 'সীল আর মেরিনদের প্রোগ্রামটাই বেছে নিচ্ছি আমরা। ওরা যদি ব্যর্থ হয়, স্পেকটর জেটগুলোকে পাঠানো হবে, আর তোমার বাহিনীকে অর্ডার দেবে যা কিছু আছে সব যেন তীর থেকে ছুঁড়তে শুরু করে ওরা।'

'নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম?'

মাথা নাড়লেন প্রেসিডেন্ট। 'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন তিনি। 'আমার নিজের দেশবাসীকে পাইকারী ভাবে হত্যা করার হুকুম আমি দিতে পারি না, যাই ঘটুক না কেন।'

'সূর্য ওঠার আগে আমাদের হাতে আধ ঘন্টা সময় আছে,' মৃদু গলায় বললেন অ্যাডমিরাল টিমোথি মার্চ। 'কামান দাগার জন্যে দিনের আলো দরকার হবে কবীর চৌধুরীর। ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করার আগে আইওয়ার সমস্ত রাডার অপারেটেড

আর অটোমেটিক-ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম সরিয়ে নেয়া হয়েছে। টার্গেট এলাকায় বা কাছাকাছি কোথাও একজন স্পটার না থাক-লে ঠিক জায়গায় আঘাত করতে পারবে না একটা শেলও। একজন স্পটার না থেকেই পারে না, রেডিওর সাহায্যে সে-ই কবীর চৌধুরীকে রেঞ্জ ইত্যাদি জানাবে।'

'হয়ত রাস্তার ওপারেই কোনো ছাদে বসে আছে সে,' বল-লেন প্রেসিডেন্ট, চুমুক দিলেন কফির কাপে।

'অসম্ভব নয়,' বললেন মার্চ। 'যাই হোক, বেশিক্ষণ রেডিও ব্যবহার করতে হবে না তাকে, কমপিউটারাইজড্ ট্রায়াঙ্গুলেশন মনিটরস্ সেট আপ রয়েছে আমাদের, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বের করে ফেলবে তার হদিশ।'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আপাততঃ মন্দের ভালো একটা ব্যবস্থা করা গেছে। এখন দেখা যাক।'

'আমার আরেকটা কথা, মিঃ প্রেসিডেন্ট,' বললেন হিগিনস, 'সবশেষে বলব বলে ঠিক করে রেখেছিলাম।'

'বলো।'

'কুইক ডেথ প্রজেক্টাইল,' বললেন হিগিনস। 'আমরা যদি অক্ষত অবস্থায় দখল করতে পারি ওগুলো, ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের ল্যাবরেটরীতে পাঠিয়ে অ্যানালাইজ করার ব্যবস্থা...'

'প্রশ্নই ওঠে না!' প্রতিবাদ করলেন মরগান। 'ওগুলো অবশ্যই নষ্ট করে ফেলতে হবে। ও-ধরনের ভয়ংকর একটা অস্ত্র রেখে দিয়ে লাভ নেই কোনো।'

'আরো জরুরী একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে,' সবাইকে সতর্ক

করে দিয়ে বললেন ডিফেন্স সেক্রেটারী চার্লস উইলসন।

সাথে সাথে সবার চোখ গিয়ে পড়ল স্ক্রীনে। ছোঁ মেরে একটা রিসিভার তুলে নিলেন টিমোথি মার্চ। চিৎকার করে নির্দেশ দিলেন তিনি। 'স্টার্ণের পিছনে আর ওপরে লেন্স নিয়ে যাও!'

অদৃশ্য হাত নিষ্ঠার সাথে দ্রুত নির্দেশ পালন করল, ক্যামেরা তার ইমেজ এরিয়া বাড়াবার সাথে সাথে ব্যাটলশিপের কাঠামো ছোটো হয়ে গেল। সবার চোখ পড়ল এক সেট এয়ারক্রাফট-নেভিগেশন লাইটের ওপর। উজানের দিক থেকে আসছে।

ব্যাপারটা কি?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'একটা হেলিকপ্টার,' রেগে গেছেন জেনারেল হিগিনস। 'নিশ্চয়ই বোকা কোনো সিভিলিয়ানের কৌতূহল হয়েছে, ঢুঁ মেরে দেখতে আসছে জাহাজটাকে।'

সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠে ভিড় করে দাঁড়ালেন স্ক্রীনের সামনে। উদ্বেগের ছাপ ফুটে উঠেছে সবার চেহারায়। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন নেভিগেশন্যাল আলোর দিকে। নদীতে আটকে পড়া আইওয়ার দিক ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে 'কপ্টারটা।

'আমাদের লোক রেডি হবার আগেই কবীর চৌধুরী যদি ভয় পেয়ে কামান দাগতে শুরু করে,' চাপা উত্তেজনার সাথে বললেন অ্যাডমিরাল মার্চ, 'আমাদের জন্যে সেটা একটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। কতো লোক মারা যাবে তা একমাত্র খোদাই বলতে পারেন।'

পোটোম্যাক নদীর মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আইওয়া। ইঞ্জিনগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, কোথাও কোনো শব্দ নেই।

চার্লস এখন আর চীফ ইঞ্জিনিয়ার নয়, ক্যাপ্টেনের নির্দেশে সে এখন গানারি অফিসার। ব্রিজে উঠে আসছে। ভয়ে দুরু দুরু করছে বুকের ভেতরটা। রাশভারী, বদ-মেজাজী মানুষ ক্যাপ্টেন, দেখলেই ভয় করে, চোখের দিকে তাকানো যায় না, কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হয় না। কিন্তু নিচে ক্রুদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেধে উঠছে, চাইলেও এখন মুখ বুঁজে থাকা সম্ভব নয়।

ব্রিজে উঠে চার্লস দেখল ক্যাপ্টেন একটা ছোটো রেডিও সেটের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বুদ্ধি করে নিপুণ ভঙ্গিতে একটা স্যালুট ঠুকল সে। 'মাফ করবেন, ক্যাপ্টেন, আপনার সাথে কিছু কথা ছিল আমার।'

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ, চার্লসের কাঁধে মস্ত একটা হাত রাখল সে। 'কি ব্যাপার, চার্লস, মাই ডিয়ার বয়?'

ক্যাপ্টেনকে খোশমেজাজে পেয়ে স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে বাঁচল চার্লস। ক্রুদের প্রশ্নটা সংক্ষেপে তুলল সে, 'এ আমরা কোথায় এসেছি, স্যার?'

সাথে সাথে উত্তর দিল কবীর চৌধুরী, যেন প্রশ্নটার জন্যে আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল সে। 'অ্যাবারডিন প্রুভিং গ্রাউণ্ডে। জায়গাটার সাথে পরিচয় আছে তোমার, চার্লস?'

'না, স্যার।'

'এখানে মার্কিনীরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ টেস্ট করে।'

'কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম···মানে, ক্রুদের ধারণা ছিল, আইওয়াকে সাগরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

চোখ সরিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল চৌধুরী। 'নো, মাই বয়। ইয়াঙ্কিরা দয়া করে তাদের টার্গেট গ্রাউণ্ডে আমাদেরকে গানারি প্র্যাকটিস করার অনুমতি দিয়েছে।'

'কিন্তু স্যার, এখান থেকে বেরুব কিভাবে?' চার্লসের চেহারায় অস্বস্তি আর বিস্ময়ের ছাপ। 'জাহাজের বো তো মাটির ভেতর সেঁধিয়ে গেছে!'

আশ্বাস দিয়ে হাসল কবীর চৌধুরী। 'ভয় পেয়ো না, চার্লস। জোয়ার এলে আমাদেরকে কোনো চেষ্টাই করতে হবে না, নিজে থেকেই কাদা থেকে বেরিয়ে আসবে আইওয়া।'

চেহারা থেকে ভীতির ছাপ দূর হয়ে গেল চার্লসের। 'কথাটা শুনে শান্ত হবে ওরা,' বলল সে।

'ভেরি গুড, চার্লস,' চার্লসের পিঠ চাপড়ে দিল কবীর চৌধুরী। 'যা বললে খুশি হয় ওরা, তাই বলবে তুমি ওদেরকে। এবার স্টেশনে ফিরে যাও, গান লোড করার কাজ কতোদুর এগিয়েছে দেখো।'

স্যালুট করে চলে গেল চার্লস। আবার রেডিও সেটের ওপর ঝুঁকে পড়ল কবীর চৌধুরী, কিন্তু এক মুহূর্ত পর ঝট করে সিধে হয়ে দাঁড়াল সে। এয়ারক্রাফটের আওয়াজ! আকাশের দিকে তাকাল সে। ফিকে হতে শুরু করেছে অন্ধকার। পুব দিকের আকাশে রঙবেরঙের আলো দেখা যাচ্ছে। একটা হেলিকপ্টার

আসছে উজানের দিক থেকে। ছোঁ মেরে একজোড়া নাইট-গ্লাস তুলে নিয়ে চোখে তুলল সে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে 'কপ্টারটা। আবছাভাবে দেখা গেল তার কাঠামো, নুমা লেখা পরিচিতিটা চোখে পড়ল না তার। কোনো সিভিলিয়ানের 'কপ্টার হবে, ভাবল সে, বিপদের কোনো ভয় নেই। অলস-ভঙ্গিতে চলে যাচ্ছে, ব্যস্ততা বা উত্তেজনার কোনো লক্ষণ নেই। ব্রিজ কাউন্টারে বায়নোকুলারটা রেখে আবার রেডিওর দিকে মন দিল সে। একটা কানের সাথে হেডসেটটা চেপে ধরে মাইক্রো-ফোনের বোতাম টিপে দিল।

'রেড মুন ওয়ান কলিং রেড মুন টু। ওভার।'

প্রায় সাথে সাথে অপর প্রান্ত থেকে সাড়া দিল পার্কার, 'স্পষ্ট এবং পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি, স্যার।'

'রেডি, টার্গেট রেঞ্জ?'

'ইয়েস, স্যার।'

'গুড,' বলল কবীর চৌধুরী। রিস্টওয়াচ দেখল সে। 'পাঁচ মিনিট দশ সেকেণ্ড বাকি আর।'

'ইয়েস, স্যার। ওভার।'

বোতাম টিপে মাইক অফ করে দিল কবীর চৌধুরী। আকা-শের দিকে তাকিয়ে দেখল, ওয়াশিংটনের দিকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে হেলিকপ্টারটা।

ঠিক সেই মুহূর্তে মিনার্ভা এম ডাবল এইট হেলিকপ্টারের কন্ট্রোল বদলে নিচের দিকে ডাইভ দিল কর্ণেল রেজনিক। সেই

সাথে মেরীল্যাণ্ডের ওপর বিশাল এলাকা জুড়ে বাঁক নিচ্ছে। পাতা-ঝরা গাছের ঠিক ওপর দিয়ে এগোচ্ছে মিনার্ভা, ওয়াটার টাওয়ারগুলোকে এড়াবার জন্যে গতি বদলাচ্ছে মাঝে মধ্যে। এয়ারফোনে রূঢ় আদেশের সুর। চেহারাটা গম্ভীর হয়ে উঠল রেজনিকের।

'বড় বেশি চেঁচামেচি করছে ওরা,' শান্তভাবে বলল সে। 'কোথাকার কোন্ এক জেনারেল বলছে, এলাকা ছেড়ে চলে না গেলে গুলি করে নামাবে আমাদেরকে।'

'সাড়া দিন,' বলল রানা। 'বলুন, জ্বি আজ্ঞে, আপনার আদেশ শিরোধার্য।'

'কি পরিচয় দেব নিজেদের?' জানতে চাইল রেজনিক।

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'সত্যি কথাই বলুন। নুমা, 'কপ্টার, স্পেশাল অ্যাসাইনমেণ্টে আছি।'

কাঁধ ঝাঁকাল রেজনিক, কথা বলতে শুরু করল মাইক্রোফোনে।

'নাম-না-জানা বুড়ো জেনারেল বিশ্বাস করেছে,' বলল সে। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল রানার দিকে। 'আপনি এবার তৈরি হোন। অনুমান, আট মিনিট পর ঝাঁপ দেবেন আপনি।'

গম্ভীর থমথমে মুখে বসে আছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। চেহারা দেখে বোঝা যায়, মনের ভেতর তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্ছে তাঁর।

সীট বেল্ট খুলে ফেলল রানা। অ্যাডমিরালের সীট বেল্ট খোলা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর 'কপ্টারের

কার্গো কম্পার্টমেন্টের দিকে এগোল। রেজনিকের পাশে থামল একবার, তার কানে কানে বলল, 'সাবধান, কর্ণেল,' ঠাট্টার ছলে রেজনিককে সতর্ক করে দিল ও। 'একটু এদিক ওদিক হলেই আই-ওয়ার গায়ে রক্তাক্ত একটা কুৎসিত দাগে পরিণত হব আমি।'

'কিচ্ছু ভাববেন না,' সহাস্যে বলল রেজনিক। 'আপনি শুধু জান-পরাণ দিয়ে ঝুলে থাকবেন, মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়িয়ে নিয়ে যাবো আমি 'কপ্টার। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই যদি ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় আপনাকে, গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, আপনি যাতে পানিতে পড়েন তার ব্যবস্থা আমি করতে পারব।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল রানা।

'ফিকে হয়ে আসছে অন্ধকার,' বলল রেজনিক। 'চোখে ধূলো দেবার জন্যে চক্কর শেষ করে পশ্চিম দিক থেকে এগোব আমরা।' উইণ্ডশিল্ড থেকে মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টি ফেরাচ্ছে না এখন সে। 'নেভিগেশন লাইট অফ করে দিচ্ছি। গুড লাক।'

রেজনিকের কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে অপ্রশস্ত কার্গো কেবিনে এসে ঢুকল রানা। ওকে অনুসরণ করলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। ককপিটের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন তিনি।

কার্গো কেবিনের ভেতরটা বরফের মত ঠাণ্ডা। লোডিং হ্যাচটা খোলা রয়েছে, ভোর অন্ধকারের হিমেল বাতাস অ্যালু-মিনিয়াম গম্বুজের ভেতর তীর বেগে ঢুকে ছুটোছুটি করছে। হার-নেসটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। কবীর চৌধুরীর মেসেজটা পাবার পর থেকে খুব কম কথা বলছেন তিনি। হারনেসটা স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকে নিল রানা।

কি যেন বলতে গিয়ে ইতস্ততঃ করে থেমে গেলেন অ্যাডমিরাল। ভাবাবেগের ক্ষীণ একটু ছায়া দেখা গেল তাঁর চেহারায়, কিন্তু মুহূর্তে সেটা মিলিয়ে গেল আবার। তারপর তিনি বললেন, 'ব্রেকফাস্টে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব আমি।'

'পোচ করা ডিম, বাটার-টোস্ট, জেলি, তারপর আপনার যা খুশি,' বলেই হিম-শীতল অন্ধকারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা।

ওয়েট স্যুট পরছে সীল কমব্যাট ইউনিটের লিডার লেফটেন্যান্ট র‍্যাণ্ডি কোহেন। রাগে গজগজ করছে সে। হাই কমাণ্ডের মাথায় ভূত চেপেছে আর কি! ঘণ্টাখানেক আগে গভীর ঘুম থেকে তুলে হড়বড় করে এই বিদঘুটে অ্যাসাইনমেণ্টের কথা বলা হয়েছে তাকে, যার হাতামাথা কিছুই বুঝতে পারেনি সে। গত সাত বছরের নেভী জীবনে এ-ধরনের ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। মাথায় রাবার হুডটা গলিয়ে কান দুটো লাইনিঙের নিচে ঢেকে নিল সে, তারপর ধীর পায়ে এগোল মোটাসোটা একজন লোকের দিকে। একটা চেয়ারে বসে রয়েছে লোকটা। ব্রিজ রেইলিঙের ফাঁক গলে পা দুটো বেরিয়ে গেছে বাইরে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পোটোম্যাক নদীর দিকে।

'ব্যাপারটা কি আসলে?' প্রশ্ন করল লেফটেন্যান্ট কোহেন।

একটু নড়েচড়ে বসল কোস্ট গার্ড পেট্রল বোটের কমাণ্ডার লেফটেন্যান্ট আর্নেস্ট বাকলার। চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি ফুটে উঠল তার, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আপনার মতো আমিও ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছি না।'

'পোটোম্যাক নদীতে ব্যাটলশিপ, এই গাঁজাখুরী গল্প আপনি বিশ্বাস করেন?'

'কিভাবে!' অবাক সুরে বলল বাকলার। 'উজানে, ওয়াশিংটন নেভী ইয়ার্ডে চার হাজার টন ডেস্ট্রয়ার দেখেছি আমি···তাই বলে পঞ্চাশ হাজার টন ব্যাটলশিপ? অসম্ভব!'

'জাহাজে চড়াও হয়ে স্টার্ণের দিকটা মেরিন হেলিকপ্টার-অ্যাসল্ট টিমের জন্যে দখল করো,' ঝাঁঝের সাথে বলল কোহেন 'ভাবছি, এটা কোনো অর্ডার, নাকি পাগলের প্রলাপ?'

হঠাৎ হাসল বাকলার। 'আমার কি মনে হয় জানেন? মেয়েমানুষ আর মদ নিয়ে খুব হৈ-হুল্লোড় হচ্ছে ওখানে, মনে করুন পিকনিকে যোগ দিতে যাচ্ছি আমরা···

'এই ভোর অন্ধকারের কনকনে ঠাণ্ডায় তাও কারো ভালো লাগবে না।'

'যাই হোক, একটু পরই জানা যাবে সব। শেরিডান পয়েন্ট ঘুরতে আর দু'ঘন্টা বাকি আছে, বাঁক নেবার পর নিশ্চয়ই আমরা দেখতে পাবো···' হঠাৎ বাকলার থেমে গেল, মাথাটা একদিকে একটু কাত্ করে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে সে। 'শুনতে পাচ্ছেন?'

হাত তুলে কান দুটোকে আড়াল করে ঘাড় ফেরাল কোহেন, পেট্রল বোটের পিছনের আকাশে তাকাল। 'মনে হচ্ছে একটা হেলিকপ্টার?'

'নরক থেকে বাদুড় আসছে নাকি?' অবাক গলায় বলল বাকলার। 'আলো নেই কেন?'

'হায় খোদা!' আঁতকে উঠল কোহেন।' 'মেরিন ট্রুপস! সময়ের আগেই রওনা হয়ে গেছে ওরা!'

পরমুহূর্তে, পেট্রল বোটের মাত্র দুশো ফিট ওপরে দেখা গেল হেলিকপ্টারটাকে। প্রচণ্ড গর্জন তুলে তীর বেগে উড়ে গেল সেটা, অন্ধকারে তার কাঠামোটা শুধু দেখা গেল এক ঝলক। পেট্রল বোটের সবাই চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে কপ্টারটার গমন পথের দিকে, হতভম্ব হয়ে গেছে ওরা, কেউ লক্ষ্যই করল না যে আরেকটু নিচে এবং 'কপ্টারের সামান্য একটু পিছনে আবছা একটা মানুষের আকৃতি ঝুলছে। ঝুলন্ত মূর্তিটা ডেকের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় ধাক্কা খেল রেডিও অ্যান্টেনার সাথে, ভেঙে গেল সেটা, নিয়ে চলে গেল সাথে করে।

'আরে!' সবিস্ময়ে বলল কোহেন। 'ওটা আবার কি!'

নদীর মাত্র ত্রিশ ফিট ওপরে নুমা হেলিকপ্টারের সাথে ঝুলছে রানা। পেট্রল বোটের অ্যান্টেনাকে শেষ মুহূর্তে দেখতে পেল ও। পা দুটো সামনে নিয়ে গিয়ে ভাঁজ করছে, এই সময় সংঘর্ষটা ঘটল। ভাগ্য ভালো, নিতম্বের কাছে মোটা টিউবিঙের সাথে সংক্ষিপ্ত মৃদু একটু ধাক্কা লাগল মাত্র, ভেঙে গেল অ্যান্টেনা, কিন্তু একটা তারও জড়াতে পারল না শরীরটাকে।

দিগন্তরেখার ঠিক ওপর ঘন কালো একসার মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়ে রয়েছে দিনের নতুন সূর্য, কুয়াশায় প্রতিহত হয়ে তার আভা আশপাশে কোথাও এসে পৌঁছায়নি। বাতাস যেন হিমের ছুরি। চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে রানার।

নিচে কালো পারদের মতো আবছা একটা ঝলক যেন পোটোম্যাক নদী, যার কোনো শেষ নেই। ঘণ্টায় দুশো মাইল গতিতে উড়ে যাচ্ছে রানা। দুই তীরে দাঁড়ানো গাছগুলো গাড়ির মিছিলের মতো সাঁ্যাত্ সাঁ্যাত্ করে পিছিয়ে যাচ্ছে। আকাশের দিকে তাকাল ও, হেলিকপ্টারের দরজার কাছে ম্লান একটা গোলাকার আকৃতি দেখা যাচ্ছে, চিনতে পারছে, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের উদ্বিগ্ন মুখ ওটা।

প্রকাণ্ড এক বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে নদী। মোড় ঘুরছে রেজনিক, হারনেসের সাথে একপাশে সরে যাচ্ছে রানা, সেই সাথে পাক খাচ্ছে। তারপর আবার যখন সোজা হলো 'কপ্টার, আগের পজিশনে 'কপ্টারের সামান্য পিছনে চলে এলো রানা, এখন আর পাক খাচ্ছে না। সামনে তাকাতেই কেন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা। আইওয়ার প্রকাণ্ড শরীরটা দেখা যাচ্ছে, গোবেচারা ভঙ্গিতে উজানের দিকে মুখ তুলে রয়েছে তার ফরওয়ার্ড গান।

আস্তে করে থ্রটল ঠেলে 'কপ্টারের স্পীড কমিয়ে আনল রেজনিক। হারনেসের স্ট্র্যাপ বুকে চেপে বসছে অনুভব করে ঝাঁপ দেবার জন্যে হাত দুটো ভাঁজ করল রানা।

কণ্ট্রোল কেবিনের সামনের উইণ্ডশীল্ড দিয়ে আইওয়ার সুপারস্ট্রাকচার আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। জাহাজের স্টারবোর্ড সাইডের ওপর, মেইন ব্রিজের ঠিক পিছনে, 'কপ্টার থামাল রেজনিক। পরমুহূর্তে নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। ধীরে ধীরে গতি কমিয়ে আনা উচিত ছিল।

প্রচণ্ড একটা দোলা খাবে এখন রানা, সুপারস্ট্রাকচারের সাথে ধাক্কা খেয়ে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যেতে পারে।

হঠাৎ সামনের দিকে প্রচণ্ড একটা টান অনুভব করল রানা, তারপর বাতাস কেটে শোঁ শোঁ করে এগোতে শুরু করল সামনের দিকে। অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে মেইন ডেক, ওখানেই নামার প্ল্যান করেছে ও। একটুর জন্যে খালি একটা গান-টাওয়ারের সাথে ধাক্কা লাগল না। দোলার শেষ প্রান্তে চলে এসেছে ও। ফিরতি পথে কিসের সাথে ধাক্কা লাগবে বলা মুশকিল। লাগবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হয় এখন, না হয় কখনোই নয়। চট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও। কুইক রিলিজ বাটনটা টেনে দিল দ্রুত হাতে। হারনেসের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে গেল শরীরটা। তীরবেগে নেমে যাচ্ছে।

ভোরের আবছা আলোয় চোখ কুঁচকে নিচের দিকে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে তাঁর। আশংকা আর উত্তেজনায় রুদ্ধ হয়ে আছে শ্বাস। ঝপ্ করে নেমে যেতে দেখলেন তিনি রানাকে। ফরওয়ার্ড সুপারস্ট্রাকচারের পিছনে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল আইওয়াও। কোণাকুণিভাবে প্রায় খাড়া উঠে যাচ্ছে রেজনিক হেলিকপ্টার নিয়ে, বিদ্যুৎগতিতে বাতাস কাটছে রোটরের ব্লেডগুলো, তীরে দাঁড়ানো গাছগুলোর মাথার ওপর দিয়ে আড়ালে চলে এলো 'কপ্টার।

সেফটি স্ট্র্যাপ খুলে ককপিটে ফিরে এলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।

'গেছেন উনি, স্যার ?' দ্রুত জানতে চাইল রেজনিক।

'হ্যাঁ, নেমেছে রানা।'

'অক্ষত কিনা·

'আশা করতে পারি,' শান্তভাবে বললেন হ্যামিলটন, ইঞ্জিনের আওয়াজে তাঁর কথা ভালো করে শুনতে পেল না রেজনিক। 'আশা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের।'

সাত

আইওয়া। ব্রিজ। ভাটির দিকে চোখ পড়তেই ভুরু কুঁচকে উঠল কবীর চৌধুরীর। ফুল স্পীডে ছুটে আসছে একটা বোট। ধীরে ধীরে নিষ্ঠুর একটু হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। ওরা কারা, কেন আসছে, সবই বুঝতে পারল সে। বোতাম টিপে মাইক্রোফোনে কথা বলল।

‘চার্লস?’

‘স্যার?’

‘মেশিনগান ক্রুদেরকে পজিশন নিতে বলো। ভাটির দিক থেকে অবাঞ্ছিত একদল আগন্তুক আসছে, ওদেরকে বাধা দিতে হবে।’

‘এটা কি একটা মহড়া, স্যার?’ জানতে চাইল চার্লস।

‘না,’ কঠিন সুরে বলল কবীর চৌধুরী। ‘চরমপন্থী একদল ইয়াংকি আমাদের জাহাজ দখল করতে আসছে। তোমার লোক-দেরকে বলো, কোনো ব্যক্তি, জলযান বা এয়ারক্রাফট, সে যেই

হোক, আমাদের জাহাজ বা ক্রুদের নিরাপত্তার জন্যে হুমকি হয়ে দেখা দিলে সাথে সাথে ফায়ার করতে হবে। পশ্চিম দিক থেকে ওই যে বোটটা আসছে, ওদেরকে যে-কোনো মূল্যে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে…।'

'ইয়েস, স্যার,' উত্তেজনায় কেঁপে গেল চার্লসের গলা।

ভাটির দিকে আর একবার তাকাল কবীর চৌধুরী। ছোটো বিন্দুটা ক্রমশঃ বড় হচ্ছে আকারে। আবার মাইক তুলে নিল সে। 'মেইন ব্যাটারী।'

'মেইন ব্যাটারী রেডি, ক্যাপ্টেন।'

'সিঙ্গেল ফায়ার অন কমাণ্ড,' চার্টের পাশে রাখা হিসাবের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'রেঞ্জ, টোয়েন্টি-থ্রি থাউজেণ্ড নাইন হানড্রেড ইয়ার্ডস। টার্গেট বিয়ারিং, ওহ্-ওয়ান-ফোর ডিগ্রিজ।'

দু'নম্বর মেইন ব্যাটারী-টাওয়ারের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। টাওয়ার থেকে আটষট্টি ফুট লম্বা তিনটে কামান বেরিয়ে আসছে। মেকানিজম সহ প্রতিটি ব্যারেলের ওজন এক-শো চৌত্রিশ টন। সাবলীল ভঙ্গিতে বেরিয়ে এসে পনের ডিগ্রীতে স্থির হলো কামানগুলোর মাজল। হাত বাড়িয়ে ট্র্যান্স-মিট বাটনটা টিপে দিল কবীর চৌধুরী।

'পজিশনে আছো, রেড মুন টু?'

রেডিওতে স্পটার পার্কারের গলা ভেসে এলো, 'ইয়েস, স্যার।'

'চার্লস?' জানতে চাইল কবীর চৌধুরী।

'স্ট্যাণ্ডিং বাই টু ফায়ার, স্যার।'

সেই নিষ্ঠুর হাসিটা আবার ফিরে এলো কবীর চৌধুরীর মুখে। প্রতিশোধ নেবার সমস্ত আয়োজন শেষ করেছে সে। এখন শুধু তার হুকুমের অপেক্ষা। দশ বিলিয়ন ডলারের চেক আটকে দিয়ে ব্যাটারা ভেবেছিল খুব শায়েস্তা করা গেছে লাক-টাকে। কিন্তু আমাকে ওরা চিনতে পারেনি! এখন? এখন কি হবে? একটা কানাকড়িও খরচ করতে হয়নি আমাকে, অথচ প্রতিশোধ নেবার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছি। এই অপারেশনের ফি হিসেবে শুধু দশ বিলিয়ন ডলার নয়, সেই সাথে কয়েকটা ল্যাবরেটরী তৈরি করার যাবতীয় খরচ আগাম পেয়ে গেছে সে মার্কিনীদের প্রাণের শত্রু আরেক সুপার-পাওয়ারের কাছ থেকে। তাছাড়া, অপারেশনের সমস্ত খরচ তো ওরা বহন করছেই। ওদের কিছু লোক জিম্মী হিসেবে রেখেছে সে, তার কারণ মার্কিনীদের শত্রুকেও একবিন্দু বিশ্বাস করে না সে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ধ্বংসের বীজ ভর্তি বোমা ফাটিয়ে দিয়ে পালাতে হবে তাকে। কথা হয়েছে, সেই পালাবার ব্যবস্থা ওরাই করবে। যদি না করে, তার বন্ধুরা হত্যা করবে জিম্মি-দেরকে।

'রেডি, চার্লস,' মাইক্রোফোনে বলল কবীর চৌধুরী। কয়েক সেকেণ্ড বিরতি নিল সে, তারপর নির্দেশ দিল। 'ফায়ার!'

কোস্ট গার্ড পেট্রোল বোট।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজে ডেকে যারা ছিল ছিটকে পড়ে গেল সবাই। গান পাউডারের চোখ ঝলসানো আলোয় কিছুক্ষণের

জন্যে অন্ধ হয়ে গেল ওরা। আগুনের আঁচে পুড়ে গেছে মাথার চুল, জ্বালা করছে গায়ের চামড়া। আইওয়ার দু'নম্বর গান টাওয়ার থেকে মাত্র একটা কামান দাগা হয়েছে, মাথার ওপর দিয়ে গোলাটা উড়ে যাবার সময় আরেকটা ধাক্কা খেল পেট্রোল বোট।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে ব্রিজের রেলিঙের ওপর পড়ল লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার আর্নেস্ট বাকলার। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে দু'হাতে আঁকড়ে ধরল হুইলটা। বন বন করে ঘুরিয়ে ইংরেজী এস অক্ষরের মতো বাঁক নিল সে। এরপর হঠাৎ ফেটে গেল উইণ্ডশীল্ডের কাঁচ, টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। মুহূর্তের জন্যে বাকলারের মনে হলো, তাকে যেন কয়েকশো মৌমাছি আক্রমণ করেছে। ডান হাতটা ধাক্কা খেয়ে ছুটে গেল হুইল থেকে। জ্যাকেটের আস্তিনে একটা গর্ত দেখল সে, দ্রুত লাল রক্তে ভরে উঠল সেটা।

'আপনার লোকদেরকে বোটের আরেকদিকে সরিয়ে নিন!' সীল ইউনিটের লিডার লেফটেন্যান্ট কোহেনকে বলল সে। 'শালারা গুলি করছে!'

ক্রল করে ডেকে বেরিয়ে এলো কোহেন। আগুনের আঁচ আর বিস্ফোরণের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে বসছে ক্রুরা। লিডারের নির্দেশ পেয়ে ক্রল করে এগোল ওরা। আশ্চর্যের ব্যাপার, একমাত্র লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার বাকলার ছাড়া আর কেউ আহত হয়নি মেশিনগানের গুলিতে।

পেট্রোল বোটের সাইডবোর্ড বাম্পার দুম করে ধাক্কা খেল

আইওয়ার খোলের সাথে, স্থির হয়ে গেল বোট। আইওয়ার ওপর থেকে গানাররা সাইটে দেখতে পাচ্ছে না বোটকে, এখন তারা বড়জোর বোটের রাডার মাস্ট লক্ষ্য করে গুলি করতে পারে। এরপর দ্রুত একটা বাঁক নিয়ে খোলা পানির দিকে ছুটে চলল বোট। ঝাঁক ঝাঁক বুলেট তাড়া করছে ওটাকে। কিন্তু একটা বুলেটও বিশ গজের এদিকে এলো না। মেকানিকদের হাতে মেশিনগান পড়লে এর চেয়ে বেশি আর কি আশা করা যায়।

খানিক পর পিছন ফিরে একবার তাকাল লেফটেন্যান্ট বাকলার। কোহেন আর তার লোকেরা উঠে গেছে আইওয়ায়, কোথাও দেখা গেল না তাদেরকে। বোট আর আইওয়ার দূরত্ব ক্রমশঃ বাড়ছে।

ভোরবেলা ব্যায়াম করতে বেরিয়েছে কাস্টমস অফিসার ডোনাল্ড ফারগুসন। আরলিংটন মেমোরিয়াল পেরিয়ে এসে লিংকন মেমোরিয়াল ঘুরে বাড়ির পথ ধরে দৌড়াচ্ছে সে। হঠাৎ একটা আশ্চর্য আওয়াজ! থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ফারগুসন। ক্রমশঃ বাড়ছে শব্দটা, ফারগুসনের মনে হলো, তীর বেগে একটা ট্রেন ছুটে আসছে যেন, অথচ ভালো করেই জানা আছে তার, এদিকে কয়েক মাইলের মধ্যে কোনো রেলপথ নেই। পরমুহূর্তে বদলে গেল শব্দটা, হুশ শ্-শ্ করে কি যেন ছুটে গেল মাথার ওপর দিয়ে। দু'চোখ ভরা অবিশ্বাস আর আতংক নিয়ে দেখল, টোয়েনটি-থার্ড স্ট্রীটের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। বিস্ফোরণের আওয়াজটা সাথে সাথেই শুনতে পেল সে। বিশাল

এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে কংক্রিটের টুকরো, মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ধুলোর একটা পাহাড়।

বিস্ফোরণের পরও নিজেকে অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল ফারগুসন। একটা ডেলিডারি ভ্যান দেখতে পেল সে। ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়ল সেটা। উইণ্ডশীল্ডটা ভেঙে পড়েছে ভেতর দিকে। ড্রাইভিং সীট থেকে রাস্তায় নেমে এলো একজন লোক। হাত দুটো মুখের সামনে তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখতে পাচ্ছি না! হেলপ্! প্লীজ, কেউ আমাকে সাহায্য করো!'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠল ফারগুসন। ছুটল ড্রাইভারের দিকে। মুখের সামনে থেকে হাত দুটো মুহূর্তের জন্যে সরতেই চমকে উঠল সে। সারা মুখে লম্বা লম্বা কাটা দাগ, ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে।

রাস্তায় যানবাহনের ব্যস্ততা নামতে এখনো একঘণ্টা বাকি। রানওয়ের মতো বিশাল রাস্তাটা ফাঁকা পড়ে রয়েছে। পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে, কিন্তু কিভাবে? আর একটা মাত্র গাড়ি দেখতে পাচ্ছে ফারগুসন, স্ট্রীট সুইপারের গাড়ি, অলস গতিতে বাঁক নিয়ে ইণ্ডেপেনডেন্স এভিনিউয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সেটা, যেন কিছুই ঘটেনি।

'রেড মুন টু,' রেডিওর সাহায্যে পার্কারকে ডাকল কবীর চৌধুরী, 'ফায়ারের প্রতিক্রিয়া জানাও।'

'স্যার, রাস্তায় পড়েছে···'

'তোমার হিসেবে তাহলে ভুল ছিল!' কঠিন গলায় বলল কবীর চৌধুরী।

'মাফ করবেন, স্যার। আমাদের টার্গেট আরো পঁচাত্তর ফিট সামনে আর একশো আশি ফিট বাঁ দিকে।'

'শুনলে তো চার্লস?'

'অ্যাডজাস্ট করছি, ক্যাপ্টেন।'

'অ্যাডজাস্ট করেই ফায়ার করো, চার্লস।'

'ইয়েস, স্যার।'

পাঁচ ডেক নিচে ম্যাগাজিন ক্রুরা পাওয়ার হ্যামারের সাহায্যে ব্রীচের গলার ভেতর সাতাশশো পাউণ্ড ওজনের আরেকটা আর্মার-ভেদী প্রজেক্টাইল ঢোকাল।

চৌদ্দ মাইল দূরে। লিংকন মেমোরিয়াল।

ডেলিভারি ভ্যানের আহত ড্রাইভারকে ধরে ফুটপাতের ওপর বসিয়ে দিল ফারগুসন। সিধে হয়ে দাঁড়াতে যাবে, এই সময় আবার সেই আশ্চর্য শব্দ! পরমূহূর্তে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। বিমূঢ় বিস্ময়ের সাথে ফারগুসন দেখল লিংকন মেমোরিয়ালের সাদা মার্বেল পাথরগুলো কামানের গোলার মতো আকাশের দিকে এলোপাথাড়ি ছুটে যাচ্ছে। ছত্রিশটা বিশাল স্তম্ভ ফুলের পাপড়ির মতো বাইরের দিকে হেলে পড়ছে। তারপর ভেঙে পড়তে শুরু করল ভেতরের আকাশ ছোঁয়া দেয়ালগুলো। চার দিকে শুধু পাথর পড়ার ভারি আওয়াজ, সাদা ধুলোয় সামনেটা প্রায় সম্পূর্ণ ঝাপসা হয়ে গেছে।

'কি হচ্ছে? কি হচ্ছে এসব?' ভ্যানের ড্রাইভার কেঁদে উঠল।

'ভয় পেয়ো না,' সমস্ত শব্দ থেমে গেছে ইতিমধ্যে। 'ওটা আরো একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ।'

দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করছে ড্রাইভার। প্রায় ত্রিশটা কাঁচের টুকরো গেঁথে রয়েছে তার মুখে। একটা চোখ থেকে দরদর করে রক্ত বেরিয়ে আসছে, আরেকটা নেই বললেই চলে, রেটিনা পর্যন্ত দু'ফাঁক হয়ে গেছে।

গায়ের শার্ট খুলে ড্রাইভারের হাতে গুঁজে দিল ফারগুসন। 'ব্যথা সহ্য করার জন্যে এটাকে মোচড়াও, কামড়াও কিম্বা টেনে ছেঁড়ার চেষ্টা করো···কিন্তু মুখে হাত দিয়ো না। আমি তোমার জন্যে সাহায্যের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।' হঠাৎ কান পাতলো সে। দূর থেকে ক্ষীণ একটা শব্দ ভেসে আসছে। সাইরেনের শব্দ। 'পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্স আসছে,' ড্রাইভারকে বলল সে। 'ওদের-কে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে হবে···তুমি বসো, আমি আসছি।' ছুটল ফারগুসন।

ধ্বংসস্তূপের পাশ ঘেঁষে ছুটছে ফারগুসন। হঠাৎ প্রায় চমকে উঠল সে, দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে সে। এখনো একটা জিনিস মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিধ্বস্ত লিংকন মেমোরিয়ালের ভেতর। কি ভাবে সম্ভব হলো এটা, ভেবে পেল না সে। সাদা মার্বেল পাথরের স্তূপ আর ধুলোর মাঝখানে সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছে আব্রাহাম লিংকনের উনিশ ফিট লম্বা স্ট্যাচু।

নিচের দিকে তাকিয়ে আছেন লিংকন, চেহারায় গভীর বিষাদের ছায়া, চোখের দৃষ্টি অনন্তের দিকে প্রসারিত।

ক্রাডলে ঠকাস করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন জেনারেল কার্ট হিগিনস। 'ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে স্পটার,' তিক্ত গলায় বললেন তিনি। 'তার সন্ধান বের করে ফেলেছিল আমাদের মনিটর ইউনিট, কিন্তু সবচেয়ে কাছের পেট্রল সেখানে পৌঁছুবার আগেই কেটে পড়েছে সে।'

'সন্দেহ নেই, গাড়িতে রয়েছে স্পটার,' বললেন ডিফেন্স সেক্রেটারী চার্লস উইলসন। 'মুশকিল হলো, প্রতি চারটে গাড়ির মধ্যে তিনটেতেই রয়েছে সি-বি রেডিও, লোকটাকে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার।'

'রাজধানীর সমস্ত মোড়ে পুলিশ আর আমাদের স্পেশাল ফোর্স রোড ব্লকের ব্যবস্থা করছে,' হিগিনস বললেন। 'স্পটারকে যদি টার্গেট এরিয়ার বাইরে সরিয়ে রাখতে পারি আমরা, কবীর চৌধুরীকে আন্দাজের ওপর নির্ভর করে কামান দাগতে হবে।'

এনলার্জ করা লিংকন মেমোরিয়ালের স্যাটেলাইট ছবি দেখা যাচ্ছে ভিউয়িং স্ক্রীনে, সেদিকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট। 'আমেরিকানদের আঁতে ঘা দিচ্ছে লোকটা,' মৃদু গলায় বললেন তিনি। 'কিছু লোকের লাশ দেখে তারা যতটা না ক্ষেপবে, তার চেয়ে অনেক বেশি অপমান বোধ করবে একটা জাতীয় মনুমেণ্ট ধ্বংস হতে দেখলে।'

'এর পরের শেলটা যদি কিউ ডি-ভর্তি হয়...' শুরু করলেন

মরগান।

'দু'টো শেল ছোঁড়া হয়েছে,' টিমোথি মার্চের দিকে তাকিয়ে বললেন হিগিনস। 'আইওয়ার রেট অব ফায়ার হিসেব করেছেন?'

'এক আর দু'নম্বর শেলের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান ছিল চার মিনিট দশ সেকেণ্ড,' বললেন টিমোথি মার্চ। 'একটু বেশি সময় নিচ্ছে, তার কারণ বোধহয়, অনেক ইকুইপমেন্ট নষ্ট হয়ে গেছে, ক্রুর সংখ্যাও কম, যারা আছে তারাও তেমন দক্ষ নয়।'

'কিন্তু আমি ভাবছি,' এতোক্ষণে একটা চুরুট ধরালেন উইলসন, 'টাওয়ারের মাঝখানের কামানটা ব্যবহার করছে কেন কবীর চৌধুরী? বাকি দুটো···

'নিয়ম মেনে চলছে কবীর চৌধুরী,' বললেন মার্চ। 'রেঞ্জ ঠিক করার জন্যে তিনটে কামান ব্যবহারের দরকার কি? এর পরের বারও যদি তার রেঞ্জ ঠিক থাকে, একসাথে তিনটে কামান দাগবে।'

জেনারেল হিগিনসের সামনে একটা ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে শুনলেন তিনি, চেহারাটা গম্ভীর হয়ে উঠল। 'তিন নম্বর আসছে।'

পিছিয়ে এলো স্যাটেলাইট ক্যামেরা। দু'মাইল চৌহদ্দিসহ হোয়াইট হাউস দেখা গেল স্ক্রীনে। রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষার পালা। কেউ জানে না এবারের প্রজেক্টাইলটা কিউ-ডি ভর্তি কিনা, কিম্বা কোথায় সেটা আঘাত করবে। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে প্রেসিডেন্টের, মুঠো পাকিয়ে গেছে হাত দুটো। হঠাৎ লাফিয়ে

উঠল কনস্টিটিউশন এভেনিউ। রাস্তার পাশের দুটো প্রকাণ্ড গাছ বোমার মতো বিস্ফোরিত হলো, ফুটপাতে প্রায় পঞ্চাশ ফুট লম্বা গভীর একটা গর্ত দেখা গেল।

'ন্যাশনাল আর্কিভ বিল্ডিংটা ফেলে দিতে চায় কবীর চৌধুরী,' বললেন প্রেসিডেন্ট, গলার স্বরে তিক্ততা। 'শাসনতন্ত্র আর স্বাধীনতার ঘোষণা ধ্বংস করতে চায় সে।'

জেনারেল কার্ট হিগিনসের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। 'আমি আবেদন জানাচ্ছি, মিঃ প্রেসিডেন্ট,' ভারি গলাটা কেঁপে উঠল তাঁর, 'এই মুহূর্তে নিউক্লিয়ার আঘাত হেনে আইওয়াকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার অর্ডার দিন আপনি!'

ধীরে ধীরে নিচু হয়ে গেল প্রেসিডেন্টের কাঁধ, যেন শীত করছে তাঁর। 'না,' মৃদু গলায়, কিন্তু রায় ঘোষণার দৃঢ় সুরে বললেন তিনি।

হাত দুটো শরীরের দু'পাশে ঝুলে পড়ল হিগিনসের, ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। টেবিলে একটা পেন্সিল ঠুকছেন চীফ অব নাভাল অপারেশনস, টিমোথি মার্চ, কি যেন ভাবছেন।

'আরেকটা উপায় করা যায়,' ধীরে বললেন তিনি 'আইওয়ার দু'নম্বর গান টাওয়ার উড়িয়ে দিতে পারি আমরা।'

'টাওয়ার উড়িয়ে দিতে পারি?' ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন হিগিনস। চোখে আশার আলো।

'কিছু এফ-ওয়ান-টোয়েনটি স্পেক্টর জেটে সাতান (Satan) পেনিট্রেশন মিসাইল আছে,' বললেন অ্যাডমিরাল মার্চ। 'ঠিক,

জেনারেল রড ?'

এয়ারফোর্স চীফ জেনারেল রড হপকিন্স ওপর নিচে মাথা দোলালেন। 'প্রতিটি এয়ার ক্রাফটে চারটে করে সাতান মিসাইল আছে, তিন গজ নিরেট কংক্রিট ভেদ করে যেতে পারে ওগুলো।'

'বুঝলাম,' দ্রুত বললেন জেনারেল হিগিনস। 'কিন্তু লক্ষ্য ভেদে কতোটুকু সফল ? একটু এদিক ওদিক হলেই ছড়িয়ে পড়বে কিউ-ডি।'

'লক্ষ্য অব্যর্থ হবে,' ধীরস্থিরভাবে বললেন জেনারেল রড 'পাইল মিসাইল ছুঁড়েই সুইচ গাইডেন্স কণ্ট্রোল গ্রাউণ্ড ট্রুপ-সের হাতে ছেড়ে দেবে। আপনার লোক, জেনারেল হিগিনস, আইওয়ার সবচেয়ে কাছে রয়েছে—টার্গেটের দুই ফিট ডায়ামি-টারের মধ্যে আঘাত করতে পারবে ওরা।'

ছোঁ মেরে ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন জেনারেল হিগিনস, তাকিয়ে আছেন প্রেসিডেন্টের দিকে। 'কবীর চৌধুরী যদি তার ফায়ারিং সিডিউল মেনে চলে, আমাদের হাতে আর দু মিনিট সময়ও নেই।'

'তাই করো,' অনুমতি দিলেন প্রেসিডেন্ট।

গ্রাউণ্ড ট্রুপসকে নির্দেশ দিচ্ছেন জেনারেল হিগিনস, ওদিকে আইওয়ার কাঠামো আর গঠন প্রণালী জানার জন্যে একটা ফাইল খুলে পড়ছেন অ্যাডমিরাল টিমোথি মার্চ। 'আইওয়ার গান টাওয়ার সাত থেকে সতের ইঞ্চি পুরু স্টীলের আর্মার প্লেটিঙে মোড়া,' বললেন তিনি। 'ওটা হয়ত ধ্বংস করতে পারব না আমরা, তবে ক্রুদের পিলে চমকে দিতে পারব।'

'সীল কমব্যাট ইউনিট,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আমাদের পদক্ষেপ সম্পর্কে ওদেরকে সাবধান করে দেয়া যায় না?'

গম্ভীর হলো অ্যাডমিরাল মার্চের চেহারা। 'পানিতে নামার পর থেকে ওদের সাথে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই।'

আইওয়ায় ওঠার সময় কোহেনের ত্রিশজন লোকের মধ্যে ছয় জন মারা গেছে। নিজেও আহত হয়েছে সে। ট্র্যান্সমিটারটা গুঁড়ো করে দিয়ে একটা বুলেট তার বাঁ হাতের তালু ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। দু'নম্বর রেডিওটা টিমের অ্যাসিস্ট্যান্টের পিঠে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা ছিল, সে বুকে গুলি খেয়েছে। ভাটির দিকে কোথাও ডুবে গেছে লাশটা।

প্রচণ্ড গুলি বিনিময়ের পর জাহাজে উঠেছে ওরা। নাইলনের মইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে মরণপণ যুদ্ধ করতে হয়েছে ওদেরকে। জাহাজের স্টার্ণ দখল করে মেইন ডেকের দিকে এগোয় ওরা। ওখানে আরেক বার আক্রান্ত হয় ওরা। কোহেনের লোকেরা আড়ালে গা ঢাকা দেবার জন্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কে কোথায় কি অবস্থায় আছে, কিছুই জানে না সে।

দ্রুত বয়ে যাচ্ছে সময়। ল্যাণ্ডিং প্যাড দখল করার কোনো উপায় দেখছে না কোহেন। নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল সে। নিজের কানেও সে-চিৎকার পৌঁছল না, দু'নম্বর গান টাওয়ারের কামানটা গর্জে উঠল আবার।

পাহাড়ের মাথায় শূন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেরিন হেলিকপ্টার-গুলো, অধৈর্যের সাথে তার সিগন্যাল পাবার জন্যে অপেক্ষা

করছে।

এয়ারক্রাফট ক্রেন মাউন্টিঙের আড়াল থেকে সন্তর্পণে উঁকি দিল কোহেন। মেইন ব্রিজের মাথায় স্টীল প্লেটিঙের পিছন থেকে অবিরাম গর্জন করছে একটা মেশিনগান। টিমের লোকেরা আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে, তাদেরকে লক্ষ্য করেই গুলি ছুঁড়ছে আইওয়ার গানাররা।

ডান হাতে অটোমেটিক রাইফেলটা বাগিয়ে ধরল কোহেন, গুলি করতে করতে বেরিয়ে এলো ডেকে। স্টার্ণের দিকে একটা টাওয়ারের পিছনে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় কবীর চৌধুরীর লোকেরা দেখতে পেল তাকে। এক ঝাঁক বুলেট ছুটে এলো তার দিকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কোহেন, বাঁ হাঁটুর নিচে একটা গুলি লেগেছে।

ক্রল করে ডামি টাওয়ারের আড়ালে চলে এলো সে, পিছনে রেখে এলো রক্তের একটা ধারা। ডেকে শুয়ে হাঁপাচ্ছে সে। ক্ষতগুলোর ব্যথায় কাতরাচ্ছে। এই সময় মেশিনগানের একটানা আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল জেট প্লেনের তীক্ষ্ণ শব্দ।

সকালের রোদে ঝিকমিক করছে স্পেক্টর জেটের গা। কয়েকটা মিসাইল ছুঁড়ে চলে গেল ওগুলো।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এলো রানার। সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। চোখ মেলল। অন্ধকার কোথায় যেন শুয়ে আছে সে। মাথার ওপর একটা গর্ত দেখল, গর্তের কিনারাগুলো এবড়োথেবড়ো। পা আর শরীরে বুলিয়ে আঙ্গুলে চটচটে কিছু

লাগল না দেখে স্বস্তি বোধ করল ও। ক্ষতির মধ্যে একটা পাঁজরের হাড় চির খেয়েছে, আর কয়েক জায়গার চামড়া উঠে গেছে।

ধীরে ধীরে উঠে বসল রানা। মাথার ওপর তাকাল আবার। গর্তের বাইরে দিনের আলো। এতোক্ষণে বুঝল, এটা একটা প্যাসেজ। হেলিকপ্টার থেকে সুপারস্ট্রাকচারের গায়ে দড়াম করে পড়েও শরীরটা দলা পাকিয়ে না যাবার কারণটাও পরিষ্কার হয়ে গেল। স্টীল বাল্ক হেডের জায়গায় বসানো হয়েছে সিকি ইঞ্চি পুরু প্লাইউডের প্যানেল, তারই একটার ওপর কামানের গোলার মতো পড়েছিল ও। প্যানেল ভেঙে নেমে এসেছে এই প্যাসেজে।

উঠে দাঁড়াল রানা। সামনে একটা বাঁক দেখা যাচ্ছে। এগোতে যাবে, হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজের সাথে থরথর করে কেঁপে উঠল আইওয়া। ষোল ইঞ্চি কামান, বুঝতে পারল। হঠাৎ তাড়া অনুভব করল। ক'টা শেল ছুঁড়েছে কবীর চৌধুরী? কতোক্ষণ অজ্ঞান ছিল সে?

প্যাসেজ ধরে এগোল রানা। দূরে মেশিনগানের আওয়াজ। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। কে কার সাথে লড়ছে? চিন্তাটা মাথা থেকে বের করে দিল ও। কিছু এসে যায় না। সবচেয়ে জরুরী কাজ কিউ-ডি প্রজেক্টাইল দুটোকে অকেজো করা। কিন্তু এরই মধ্যে দেরি হয়ে যায়নি তো?

বিশ ফিট এগিয়ে থামল রানা। এক পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করল, আইওয়ার ডেক প্ল্যান ওটা,

আরেক পকেট থেকে বের করল টর্চ। জাহাজের ঠিক কোন্ জায়গায় রয়েছে জানার চেষ্টা করছে। মূল্যবান দুটো মিনিট পার হয়ে গেল এই কাজে।

প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে এলো রানা। চারদিকে। আকাশ ছোঁয়া সব আকৃতি, জাহাজের সুপারস্ট্রাকচার ওগুলো। ফরওয়ার্ড শেল ম্যাগাজিনের দিকে এগোল ও। হঠাৎ নিরেট কি যেন একটা ধাক্কা মারল আইওয়াকে, বিশাল জাহাজটা ঝাঁকি খেল একটা। চারদিক থেকে মেঘের মতো ধোঁয়া উঠছে। তাল সামলাবার জন্যে হাত দুটো ডানার মতো শূন্যে মেলে দিল রানা।

সাতান মিসাইল দু'নম্বর গান টাওয়ারের ক্ষতি করেছে, কিন্তু ধ্বংস করতে পারেনি। স্টীল প্লেটিঙের ছয় জায়গায় গর্ত হয়েছে, কোথাও এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়নি। পোর্টের দিকের গান ব্যারেলের রিকয়েল বেসে মারাত্মক ফাটল ধরেছে। বাকি সব ঠিকই আছে।

কাঁচ ভাঙা ব্রিজের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আপন মনে হাসল কবীর চৌধুরী। ভাগ্য সহায়তা করছে তাকে। অবশিষ্ট মাত্র কয়েকটা স্টীল বাল্কহেডের একটার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল সে, এই সময় আঘাত করে সাতান মিসাইল।

হাত বাড়িয়ে মাইক্রোফোনটা তুলে নিল সে। 'চার্লস, ক্যাপ্টেন বলছি। আমার গলা শুনতে পাচ্ছ?'

উত্তর নেই।

'চার্লস?' ভরাট গলায় হাঁক ছাড়ছে কবীর চৌধুরী।

'জবাব দাও, চার্লস ! রিপোর্ট করো।'

ঘড়ঘড় করে উঠল স্পীকার। 'ক্যাপ্টেন ফক্স ?' অপরিচিত কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ। তুমি কে ? চার্লস কোথায় ?'

'নিচে, ম্যাগাজিনে, স্যার। হোয়েস্ট ভেঙে গেছে, মিঃ চার্লস সেটা দেখতে গেছে। আমি টম, স্যার। মিঃ চার্লসের অ্যাসিসট্যান্ট।'

'কামান চালাতে জানো ?'

'হ্যাঁ···মানে, কাজ চালিয়ে নিতে পারব, স্যার।'

'রিপোর্ট করো।'

'তিনটে কামানই লোড করা আছে,' বলল টম। 'ক্রুদের অবস্থা ভালো নয়, স্যার। প্রায় সবাই আহত হয়েছে। প্রায় সবার কান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে যাদের তারা বোধ হয় বেঁচে নেই।'

'কোত্থেকে বলছ তুমি ?'

'টাওয়ারের অফিসার্স বুথ থেকে, স্যার। প্রচণ্ড গরম এখানে, স্যার। সবাই ঘামছি আর হাঁপাচ্ছি।'

'আমি আসছি,' বলল কবীর চৌধুরী। কিউ-ডি ভর্তি গোলা-টা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ছুঁড়তে চায় সে।

'কিন্তু বাইরের ডেক হ্যাচটা বিস্ফোরণের ধাক্কায় ভেঙে ডেবে গেছে, স্যার। আপনাকে ম্যাগাজিন হয়ে আসতে হবে, স্যার।'

'ধন্যবাদ, টম। স্ট্যাণ্ড বাই।'

জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকাল কবীর চৌধুরী। আর

মাত্র কয়েক মিনিট। আমেরিকাকে ধ্বংস করার বীজ ছড়াচ্ছে যাচ্ছে সে। সেই নিষ্ঠুর হাসিটা আবার দেখা গেল তার ঠোঁটে। ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে মাইক্রোফোনটা তুলে নিল সে।

'রেড মুন টু, কাম ইন।'

'ইয়েস, স্যার।'

'হোয়াইট হাউসের রেঞ্জ?'

'দুঃখিত, স্যার।'

'হোয়াট!' হুংকার ছাড়ল কবীর চৌধুরী।

'খাকী ইউনিফর্ম পরা পুলিশ, স্যার। ঘেরাও করে ফেলেছে আমাকে। গুড লাক, স্যার।'

মাইক্রোফোনের রিসিভারের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকল কবীর চৌধুরী। একজন অন্ধ ভক্তকে হারাল সে। কাঁধ ঝাঁকাল···কিছু করার নেই। বড় কোনো কাজ করতে হলে কিছু লোককে হারাতেই হয়।

'ঝাড়ুদার,' ভারি গলায় বললেন জেনারেল হিগিনস। 'কবীর চৌধুরীর স্পটার ছদ্মবেশ নিয়ে একটা সুইপার কার চালাচ্ছিল। সিটি পুলিশ এখন তাকে থানায় নিয়ে যাচ্ছে।'

'বোঝা গেল রোড ব্লকগুলো কিভাবে পেরিয়ে গেছে।'

এসব কিছুই যেন শুনছেন না প্রেসিডেন্ট। আইওয়ার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি। স্ক্রীনে ছোটো ছোটো কালো রঙের মূর্তি দেখতে পাচ্ছেন তিনি, আড়াল থেকে দৌড়ে গা ঢাকা দিচ্ছে আড়ালে। এক এক করে গুণলেন তিনি, দশজন

সীল সদস্য হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে জাহাজের ডেকে।

'ওদের জন্যে কিছুই করার নেই আমাদের?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন হিগিনস। 'তীর থেকে ফায়ার ওপেন করলে নিজেদের লোককেই মারা হবে। না মিঃ প্রেসিডেন্ট, ওদেরকে সাহায্য করার কোনো উপায় নেই।'

'মেরিন অ্যাসল্ট টীম পাঠাতে অসুবিধে কি?'

'আইওয়ার পেছনের ডেকে হেলিকপ্টার নামলে মেশিন-গানের গুলিতে একজনও বাঁচবে না। পঞ্চাশজন করে লোক আছে প্রত্যেক 'কপ্টারে।'

'জেনারেলের সাথে আমি একমত,' বললেন অ্যাডমিরাল মার্চ। 'সাতান আমাদেরকে দম ফেলার খানিকটা সময় দিয়েছে, যতোদুর মনে হচ্ছে, দু'নম্বর গান টাওয়ার অকেজো হয়ে গেছে। সীলকে শত্রু নিধনের জন্যে খানিকটা সময় এখন দিতে পারি আমরা।'

চেয়ারে হেলান দিলেন প্রেসিডেন্ট। নিজের তিন পাশে বসা সহকর্মীদের দিকে তাকালেন তিনি। 'আমরা তাহলে অপেক্ষা করব—এই বলতে চাইছেন আপনারা? চোখের সামনে ওই পর্দায় দেখছি আমাদের তরুণ ছেলেরা গুলি খেয়ে মারা যাচ্ছে—অথচ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব আমরা?'

'হ্যাঁ, স্যার,' উত্তর দিলেন জেনারেল হিগিনস। 'আপাততঃ বসে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই আমাদের।'

জাহাজের ডায়াগ্রাম দেখে নিয়ে ছুটল রানা। অন্ধকার

একটা প্যাসেজে ঢুকল ও। তারপর অনেকগুলো অলিগলি পেরিয়ে একটা বাল্কহেড দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ডায়াগ্রামে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুঠোর ভেতর মুচড়ে দলা পাকাল সেটাকে, ছুঁড়ে ফেলে দিল ডেকের ওপর। দরজার ওদিকেই প্রজেক্টাইল স্টোর।

দরজার গায়ে কাঁধ ঠেকিয়ে একটু একটু করে চাপ বাড়াল রানা। ঘড়ঘড় আওয়াজ করে খানিকটা ফাঁক হলো কপাট। ভেতরে আবছা আলো দেখা গেল। ভারি মেশিনারির ধাতব শব্দের সাথে মানুষজনের চেঁচামেচি শুনতে পেল ও। চেইন টানা-হেঁচড়া করার ঝনঝন শব্দ, তার সাথে ইলেকট্রিক মোটরের গুঞ্জন। শব্দগুলো ওপরের কোথাও থেকে আসছে বলে মনে হলো। সন্তর্পণে দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা।

হোয়েস্ট টিউবের কাছে আর্মার-ভেদী শেলগুলো নিখুঁত-ভাবে সাজানো রয়েছে। দুটো হলুদ বালবের নিচে চোখা মাথা-গুলো চকচক করছে। সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোল রানা। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ওপরের ডেকে দু'জন নিগ্রো ক্রু হোয়েস্ট টিউবের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাতুরী দিয়ে এলিভেটর ক্রাডলের গায়ে বাড়ি মারছে। বিস্ফোরণে ঝাঁকি খেয়েছিল আই-ওয়া, সেই ঝাঁকিতে নষ্ট হয়ে গেছে এলিভেটরের মেকানিজম। পিছিয়ে এলো রানা। আড়ালে এসে পরীক্ষা করতে শুরু করল শেলগুলো। মোট একত্রিশটা রয়েছে। মাত্র একটার মাথা গোল। কিউ-ডি ভর্তি আরেকটা শেল নেই এখানে।

বেল্ট থেকে একটা টুল কিট নামাল রানা। টর্চটা জ্বেলে

একটা উঁচু জায়গায় শুইয়ে রাখল সেটাকে। ওটার পাশেই রাখল কোল্ট অটোমেটিক। তারপর হাঁটু গেড়ে বসল ও। আলতো-ভাবে ছুঁলো কিউ-ডি ভর্তি শেলের মাথাটা। হাতে লকিং স্ক্রুর স্পর্শ পেল ও। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুলতে শুরু করল সেগুলো। প্যাঁচগুলো এঁটে বসে আছে, ঘোরাতে গিয়ে পেশীর সবটুকু জোর লাগাতে হলো ওকে।

মাথার ভেতর একটাই চিন্তা, দ্বিতীয় শেলটা যদি ইতিমধ্যে ছোঁড়া হয়ে গিয়ে থাকে, এতো পরিশ্রম সব বৃথা যাবে। হঠাৎ শেষ স্ক্রুটা বেরিয়ে এলো গর্ত থেকে। শেলের নাকটা চলে এসেছে রানার দু'হাতে। সাবধানে সেটাকে এখন নামিয়ে রাখল ও। তারপর ওয়রহেডের ভেতরে তাকাল।

ভেতরে একটা এক্সপ্লোসিভ চার্জ রয়েছে। ওটা বিস্ফোরিত হলে ওয়রহেড ফেটে বেরিয়ে আসবে কিউ-ডি ভর্তি ক্ষুদে এক ঝাঁক বোমা। এক্সপ্লোসিভ চার্জের কানেকশনগুলো বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করল রানা। কাজটা বিপদজনক বা জটিল কিছু নয়। কিন্তু গভীর মনোযোগের সাথে কাজ করছে বলে হাত দু'টো একটু একটু কাঁপছে। রাডার অলটিমিটারের সাথে সংযুক্ত তারটা কেটে এক্সপ্লোসিভ ডিটোনেটরটা সরিয়ে আনল ও। পকেট থেকে বের করল একটা কাপড়ের থলে। তারপর ওয়রহেডের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল।

ভেতর থেকে অতি সাবধানে কিউ-ডি বোমাগুলো বের করে থলিতে ভরল রানা। ব্যাগটা হাতে নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল ও। এগুলোর একটা বিহিত করা দরকার আগে। তারপর দ্বি-

তীয় কিউ-ডি শেলটার খবর নিতে হবে। নিজেকে এই বলে শান্ত করল, স্টোর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেও, এখুনি সেটা ছুঁড়বে না কবীর চৌধুরী। গায়ের ঝাল মেটাবার জন্যে আর্মার-ভেদী শেলগুলো প্রথমে ছুঁড়বে সে, চরম আঘাতটা হানবে সব-শেষে।

একহাতে কাপড়ের ব্যাগ ভর্তি কিউ-ডি বোমা, আরেক হাতে কোল্ট অটোমেটিক নিয়ে বেরিয়ে এলো রানা। ওপরের ডেক থেকে হঠাৎ ওকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠল কবীর চৌধুরী, ভুরু কুঁচকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল, ধীরে ধীরে একটা মুচকি হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে—কিন্তু এসবের কিছুই জানতে পারল না রানা।

দু'হাজার ফিট ওপরে রয়েছে হেলিকপ্টার মিনার্ভা। সামান্য একটু দিক পরিবর্তন করল কর্ণেল রেজনিক। জেফারসন মেমো-রিয়ালকে পাশ কাটিয়ে ইণ্ডিপেনডেন্স এভিনিউয়ের সাথে সমান্ত-রালভাবে টাইডাল বেসিন পেরোল।

'ভিড়টা দেখছেন, স্যার?' অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে বলল সে। ইঙ্গিতে ক্যাপিটল মল দেখাল। এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত চঞ্চল মৌমাছির মতো গিজ গিজ করছে আর্মি হেলিকপ্টার।

মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'দূরে সরে থাকো। এখন যা মেজাজ ওদের, প্রথমে গুলি করে নামাবে, তারপর প্রশ্ন করবে।'

‘শেষবার কতোক্ষণ আগে কামান দেগেছে আইওয়া ?’

‘প্রায় আঠারো মিনিট আগে।’

‘ছ’নম্বর গান টাওয়ার বোধহয় ধ্বংস করে দিয়েছে ওরা।’

‘কিন্তু নিশ্চিত না হয়ে নামছি না আমরা,’ বললেন অ্যাডমিরাল। ‘ফুয়েলের অবস্থা ?’

‘চারঘণ্টা উড়তে পারব।’

সীটের ওপর নড়েচড়ে বসলেন অ্যাডমিরাল। ‘ন্যাশনাল আর্কিভ বিল্ডিঙের কাছ থেকে যতোটা সম্ভব দূরে সরে থাকো। আবার যদি কামান দাগে আইওয়া, ওটাই তার লক্ষ্য হবে।’

‘ভাবছি মিঃ রানা কতটুকু কি করতে পারলেন…’

উদ্বেগের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না অ্যাডমিরালের চেহারায়। ‘বিপদের গুরুত্ব জানা আছে তার। তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছুই নেই আমাদের।’ ঘাড় ফিরিয়ে আরেক পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি, কর্নেল যাতে তাঁর চোখে উদ্বেগের ছায়া দেখতে না পায়।

‘উচিত ছিল আমার যাওয়া,’ বলল রেজনিক। নির্ভেজাল মিলিটারি শো এটা। ট্রেনিং নেই এমন একজন সিভিলিয়ানের ঘাড়ে এই ভয়ংকর দায়িত্ব চাপানো উচিত হয়নি।

‘আর তোমার বোধহয় ট্রেনিং আছে, কর্নেল ?’

‘মাসুদ রানা একজন ইনভেস্টিগেটর হতে পারেন, অ্যাডমিরাল, কিন্তু আমি মিলিটারির লোক।’

হাসলেন অ্যাডমিরাল। ‘রানা সম্পর্কে তুমি দেখছি কিছুই জানো না।’

ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল রেজনিক। 'মানে, স্যার?'

'রানা একজন অলরাউণ্ডার। আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স—তিনটেরই স্পেশাল, আই রিপিট, রিয়েলি স্পেশাল ট্রেনিং আছে ওর।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল রেজনিক। 'তার মানে, 'কপ্টার চালাতে জানেন তিনি?'

'শুধু 'কপ্টার নয়, আরো অনেক কিছু।'

'কিন্তু উনি যে বললেন

'জানি।'

বোকা বোকা হয়ে গেল রেজনিকের চেহারা। 'কিন্তু আপনি কিছু না বলে চুপ করে ছিলেন কেন তাহলে?'

'তোমার বউ ছেলেমেয়ে আছে। আমি, একটু বুড়ো হয়ে গেছি। যুক্তির নির্দেশ মেনে নিজেকেই বেছে নিয়েছে রানা।'

অবাক হয়ে গেল রেজনিক। চেনা একটা মানুষকে এই মুহূর্তে আবার যেন নতুন করে চিনল সে। বুঝতে পারল কেন বেন নেলসন পীরের মত ভক্তি করে লোকটাকে। বিদেশী লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সেই সাথে কৃতজ্ঞতা অনুভব করল রেজনিক নিজের মধ্যে।

অন্ধকার থেকে রোদ ঝলমলে মেইন ডেকে বেরিয়ে এলো রানা। থামল। ভালো করে দেখে নিল চারদিক। পিছনের ফায়ার কন্ট্রোল ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। দু'নম্বর গান টাওয়ারের সামনের অংশ এটা। মেশিনগান, অটোমেটিক রাই-

ফেল আর রিভলভারের মুহুর্মুহু আওয়াজ শুনতে পেল ও। কিন্তু সেদিকে মন দিল না, প্রথমে ক্ষুদে কুইক-ডেথ অ্যাম্পুল-গুলোর একটা গতি করতে চায়। হাতছানি দিয়ে ডাকছে নদী। ডেকের কিনারার দিকে সতর্ক পায়ে এগোল ও। কিনারা থেকে বিশ ফিট দূরে রয়েছে এখন ও, এই সময় কালো রাবারের ওয়েট স্যুট পরা এক লোক টাওয়ারের ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো ওর সামনে। অটোমেটিক রাইফেলটা রানার বুকে তাক করল কোহেন। ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুল।

আহত হিংস্র পশুর মতো চেহারা হয়েছে লেফটেন্যান্ট কোহেনের। কবীর চৌধুরীর লোকেরা তার টিমের অর্ধেকের বেশি লোককে মেরে ফেলেছে। রক্তক্ষরণের ফলে তার অবস্থা কাহিল। রানাকে চেনে না সে, চিনতে চায়ও না। নিজের লোক ছাড়া যাকে দেখবে তাকেই গুলি করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে।

দশ ফিট দূর থেকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। কথা বলল না কেউ। পিস্তল ধরা বাঁ হাতটা নেড়ে পথ থেকে সরে যাবার নিঃশব্দ ইঙ্গিত করল রানা। তারপর এগোল। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল কোহেন। লোকটার আচরণের মধ্যে অদ্ভুত একটা কাঠিন্য আর ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। পরমুহূর্তে গুলি করল কোহেন রানার বুক লক্ষ্য করে। সিঙ্গেল শট।

গুলি হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরেই সাঁৎ করে একপাশে সরে দাঁড়াল রানা। সেই সাথে গর্জে উঠল ওর হাতের কোল্ট। বাঁ হাতের ফুটো তালু দিয়ে ডান হাতের কনুই চেপে ধরল কোহেন। হাত থেকে ঠকাস করে পড়ে গেল অটোমেটিক। গুঁড়ো হয়ে

গেছে তার কনুইয়ের হাড়।

এগোল রানা। পা দিয়ে লাথি মেরে সরিয়ে দিল অটোমেটিকটা কোহেনের নাগালের বাইরে। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে সে, তাকে পাশ কাটিয়ে কিনারার দিকে এগোল রানা।

কিনারায় দাঁড়িয়ে থলে সহ কুইক-ডেথ ভর্তি ক্ষুদে বোমাগুলো নদীতে ফেলে দিল ও।

ঘুরে দাঁড়াল, এবং ছুটল। মহামারীর বীজ ভর্তি আরেকটা প্রজেক্টাইল অকেজো করতে হবে ওকে।

আট

বিশাল গান হাউসের ভেতর রক্তের মিষ্টি গন্ধের সাথে মিশে রয়েছে বারুদ আর উত্তপ্ত তেলের কটু গন্ধ। বিস্ময় আর আতংক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি ক্রুরা। চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে ওদের। চেহারায় ভীত বিমূঢ় ভাব। অন্যান্যরা ভারি মেশিনারির মাঝখানে বিচিত্র ভঙ্গিতে পড়ে আছে। যারা বেঁচে আছে, মরণের পথে রয়েছে তারা, ব্যথায় গোঙাচ্ছে। কিন্তু সাহায্য করার কেউ নেই এখানে। কবীর চৌধুরীর নির্দেশে সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত।

তিন নম্বর কামানে ফাটল দেখা দিয়েছে বলে সেটা ব্যবহার করা হবে না। ওটায় রয়েছে আর্মার-ভেদী শেল। বাকি দুটোর মধ্যে একটায় রয়েছে কিউ-ডি ভর্তি প্রজেক্টাইল।

অফিসার্স ফায়ারিং বুথের সামনে 'ফায়ার' বাটন নিয়ে বসে রয়েছে চার্লস। কবীর চৌধুরীর নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে সে।

গান হাউসের ফ্রন্ট ব্রিজ থেকে সবাইকে ডেকে নিয়েছে কবীর

চৌধুরী। প্রত্যেককে কড়া নির্দেশ দিয়ে বলেছে, এখানে যাই ঘটুক না কেন, কেউ যেন নিজের কাজ থেকে মুখ না তোলে ফ্রন্ট ব্রিজ থেকে গান হাউসে ঢোকার দরজাটা হা হা করছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভেতরে কাউকে দেখতে পাবে না রানা।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে রানার জন্যে অপেক্ষা করছে কবীর চৌধুরী। হাতে একটা ওয়ালথার। রানার প্রিয় অস্ত্র। অনেক দিন থেকেই নিজের কাছে এটা রেখে দিয়েছে কবীর চৌধুরী। ওরই প্রিয় অস্ত্রের আঘাতে রানার ভবলীলা সাঙ্গ করতে চায় সে।

আর কয়েক মুহূর্ত পর আসবে রানা। আসবেই, জানে সে। দ্বিতীয় শেলটা অকেজো না করে আইওয়া ত্যাগ করবে না ও।

আমেরিকাকে ধ্বংস করার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছে সে। এখন শুধু ফায়ারিং বাটনে চাপ দেয়া বাকি। রানার সাথে বোঝা-পড়া শেষ করেই চার্লসকে নির্দেশ দিতে পারে সে। ব্যাস, তাহলেই পূর্ণ হবে তার প্রতিশোধ। আপন মনে হাসল কবীর চৌধুরী। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার চমৎকার একটা দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে সে। আমেরিকা তাকে ঠকিয়েছে, আমেরিকার শত্রুর খরচে তাকে উচিত সাজা দিয়ে কেটে পড়তে যাচ্ছে সে। আই-ওয়ার পাশেই, মাত্র বিশ গজ দূরে তার জন্যে অপেক্ষা করছে একটা টু-সীটার ক্ষুদে সাবমেরিন স্নরকেল। ওটাই তাকে সাগরে নিয়ে যাবে। কেউ টের পাবে না। সাগরে অপেক্ষা করছে বড় সাবমেরিন, তাতে চড়ে ভোঁ হয়ে যাবে সে গোটা উত্তর আমেরিকাকে তিনশো বছরের জন্যে মৃত্যুশয্যায় শুইয়ে দিয়ে।

হঠাৎ কান দুটো সজাগ হয়ে উঠল কবীর চৌধুরীর। ফ্রন্ট

ব্রিজে পায়ের আওয়াজ।

সিঁড়ি বেয়ে ব্রিজে উঠে এলো রানা। খানিক আগে এখানে কাজ করছিল দু'জন নিগ্রো, তারা এখন নেই। গান হাউসের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল ও। ভেতরে আলো জ্বলছে। ইলেকট্রিক মোটরের গুঞ্জনকে ছাপিয়ে উঠছে ভারি মেশিনারির কর্কশ ধাতব শব্দ। এসবের মাঝখানে শোনা যাচ্ছে ক্রুদের শোর-গোল। কিন্তু প্রায় ত্রিশগজ পর্যন্ত ভেতরে কাউকে দেখতে পেল না ও।

দরজার চৌকাঠ টপকে ভেতরে ঢুকল রানা। দ্রুত এগোল কামানের দিকে। দশ গজও এগোয়নি, এই সময় পিছন থেকে গুলি হলো। মৃদু একটা ঝাঁকি খেল রানা, শার্টের আস্তিন ফুটো করে বেরিয়ে গেছে বুলেট। গুলির আওয়াজের পরপরই ভরাট গলা শোনা গেল কবীর চৌধুরীর। 'না, ঘুরো না। হাতের ওটা ফেলো আগে। মাথার ওপর হাত তোলো। তারপর ঘুরে দাঁড়াও।'

স্থির মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল রানা।

'লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি,' বলল কবীর চৌধুরী। 'তোমার শার্টের আস্তিন ফুটো করার জন্যেই করা হয়েছিল গুলিটা। তোমাকে যদি কখনও খুন করি, তোমার চোখে চোখ রেখেই গুলি করব। তবে যদি বাধ্য করো, সে কথা আলাদা। ফেলো পিস্তল।'

ছেড়ে দিল রানা কোল্ট, ঠকাস করে শব্দ হলো পায়ের কাছে। মাথার ওপর হাত তুলল ও। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল।

সরে গিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছে কবীর চৌধুরী। সেই

নিষ্ঠুর হাসিটা ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। 'মার্কিনীদের জন্যে এতো দরদ কিসের তোমার, শুনি? ছুনিয়ার প্রায় সমস্ত সমস্যার জন্যে সুপারপাওয়ারগুলোই তো দায়ী। তাদের দালালী করছ···তাতে অবশ্য আমার কোনো আপত্তি নেই—কিন্তু, তোমাকে যতোটুকু চিনি, তাতে এমন কি আমারও মনে হয়, এই দালালের ভূমিকায় তোমাকে মানাচ্ছে না।'

কঠিন দৃষ্টি ফুটে উঠল রানার চোখে। এরই মধ্যে দুরত্বটা আন্দাজ করে নিয়েছে ও। দশ গজ। লাফ দিয়ে পৌঁছনো অসম্ভব, তার আগেই কবীর চৌধুরী গুলি করবে। 'কিউ-ডি ভর্তি শেলটা কোথায়?'

'হ্যাঁ,' মৃত্থ হাসল কবীর চৌধুরী। 'তোমার এই প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে এতোক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি।' তারপর চুপ করে থাকল সে।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'কোথায়?'

'কামানের ভেতর,' শান্তভাবে বলল কবীর চৌধুরী। 'ফায়া-রিং বাটনে আঙুল ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে আমার লোক। আমি নির্দেশ দিলেই চাপ দেবে বোতামে। এখুনি দেবো নির্দেশ? নাকি আমেরিকার এতোবড় সর্বনাশ নিজের চোখে দেখতে চাও না তুমি? ভেবে দেখো। তুমি চাইলে আগে তোমাকে শেষ করে তারপর নির্দেশ দিই। কি?'

শিউরে উঠল রানা। 'তাতে গোটা মহাদেশটা বিরান হয়ে যাবে, তুমি জানো?'

'অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন স্কটের কাছ থেকে সমস্ত তথ্য আদায় করে নিয়েছি আমি। তুমি যতটা জান, আমি তার চেয়ে কম জানি না।'

'জানো তাহলে? কোটি কোটি মানুষকে খুন করতে যাচ্ছ তুমি, ওরা তোমার কোনো ক্ষতি করেনি—তবু...'

অকস্মাৎ প্রচণ্ড অট্টহাসিতে বিস্ফোরিত হলো কবীর চৌধুরী। কিন্তু চোখের দৃষ্টি আর পিস্তলের নল রানার দু'চোখের মাঝখান থেকে একচুলও নড়ল না।

ধীরে ধীরে হাসি থামাল কবীর চৌধুরী। 'নীতিবাক্য, কেমন? এই জিনিসটা তোমাকে ছাড়ল না দেখছি। সে যাক, কেমন বোধ করছ তাই বলো। বুঝতেই পারছ, আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত বেঁচে আছো তুমি। আজ তোমাকে বাঁচাবার জন্যে সোহানা নেই। ...আর যদি মনে করো আমার হাতে মারা গেলে শহীদ হবে তুমি...'

'কিউ-ডি প্রজেক্টাইল বিস্ফোরিত হলে তুমিও বাঁচবে না,' বলল রানা। দ্রুত চিন্তা করছে ও। সত্যিই কি কামানের ভেতর রয়েছে কিউ-ডি শেলটা?

'এতো বোকা তুমি আমাকে মনে করো না,' বলল কবীর চৌধুরী। 'আমি যে পালাবার উপায় ঠিক করে রেখেছি, অনুমান করতে অসুবিধে হবার কথা নয় তোমার।' রানার মাথার ওপর দিয়ে ফায়ারিং বুথের দিকে তাকাল সে। হাঁক ছাড়ল একটা, 'চার্লস?'

'ইয়েস, স্যার।'

রানার চোখে চোখ রাখল কবীর চৌধুরী। 'একটা কথা। আমি চাই না ভুল ধারণা নিয়ে বিদায় নাও তুমি। ভেবো না হঠাৎ তোমাকে পেয়ে গেছি, তাই ঝামেলা চুকিয়ে ফেলছি। ওরা আমার দশ বিলিয়ান ডলারের চেকটা আটকে দিয়েছে, সেজন্যে তুমিও কম দায়ী নও। তাই খরচের খাতায় তোমার নামটাও টুকে রেখেছিলাম আমি। এখানে এসে তুমি আমার সময় বাঁচিয়ে দিয়েছ, সেজন্যে তোমাকে আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত। তুমি না এলে আমিই যেতাম তোমার কাছে।' থামল চৌধুরী, পরমুহূর্তে হুংকার ছাড়ল সে, 'ফায়ার!'

জানে দেরি হয়ে গেছে, তবু কোল্ট অটোমেটিকটা পায়ে ঠেকতেই ডাইভ দিল রানা। গর্জে উঠল কবীর চৌধুরীর হাতের রিভলভার। সেই সাথে দুলে উঠল আইওয়া।

কিউ-ডি ভর্তি প্রজেক্টাইল বেরিয়ে গেল কামানের ব্যারেল থেকে।

স্টারবোর্ড দিকের ব্যারেল থেকে বেরিয়ে আর্মার-ভেদী প্রজেক্টাইল তার ক্ষমতার শীর্ষে ওঠার পর ক্রমশঃ নামতে শুরু করল ন্যাশনাল আর্কিভ বিল্ডিঙের দিকে। লাইমস্টোনের তৈরি গম্বুজের দেয়াল ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকে গেল ওয়রহেড। একটুর জন্যে বই আর রেকর্ড-পত্রের একুশটা স্তম্ভ রক্ষা পেল। এগজিবিশন হলের গ্র্যানাইট পাথরের মেঝেতে বিস্ফোরিত হলো শেলটা। বিস্ফোরণের জায়গা থেকে মাত্র দশ গজ দূরে রয়েছে কাঁচের কেসে ঢাকা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। পাথরের মেঝেতে গর্ত হলো

একটা, চারদিকে সৃষ্টি হলো গভীর ফাটল। কাঁচের কেসটাকে একটা ফাটল মাত্র দু'ইঞ্চির জন্যে ছুঁতে পারল না।

দু'নম্বর শেলটায় রয়েছে কুইক-ডেথের বীজ।

ক্ষুদে জেনারেটরের সাহায্যে কুইক-ডেথ প্যাকেজের ভেতর রাডার অলটিমিটার চালু হয়ে গেছে, নিচের মাটিতে সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করেছে সেটা, তির্যকভাবে পতনের মাত্রা এবং পরিমাণ রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। ওয়রহেডটা নামছে তো নামছেই, তারপর মাটি থেকে পনেরোশো ফিট ওপরে থাকতে একটা প্যারাস্যুট খুলে গেল। নীল আকাশের গায়ে জ্বলজ্বলে কমলা রঙের ছাতা মেলে ধরল যেন কেউ।

ওয়াশিংটন। রাস্তা থেকে অনেক নিচে প্রেসিডেন্ট এবং তার উপদেষ্টারা অনড় বসে রয়েছেন যাঁর যাঁর চেয়ারে। ভিউইং স্ক্রীনে তাকিয়ে চোখ পিট পিট করে দেখেছেন ধ্বংসের বীজ ভর্তি প্রজেক্টাইলটা ধীর গতিতে নেমে আসছে। স্তব্ধ, হতভম্ব হয়ে গেছেন তাঁরা, নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। দুর্বল অসহায়বোধ করেছেন তাঁরা, কিন্তু এখনও তাঁদের মনে ক্ষীণ আশা, ওয়রহেডের ভেতরের মেকানিজমটা কোনো ভাবে হয়ত অচল হয়ে যাবে, ফাটবে না বোমাটা, অক্ষত অবস্থায় হয়ত রাজধানীর কোনো বাগানে এসে নামবে।

কিন্তু খানিক পরই অস্থিরতা দেখা দিল সবার মধ্যে।

উত্তর দিক থেকে হাল্কা বাতাস বইতে শুরু করল। প্যারাস্যুটটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন বিল্ডিঙের দিকে।

এরই মধ্যে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে রাজধানীর সমস্ত রাজপথ। লিংকন মেমোরিয়াল আর ন্যাশনাল আর্কিভ বিল্ডিং দুটোকে ঘিরে রেখেছে সেনাবাহিনী চারদিকে শুধু মানুষের মাথা দেখা যাচ্ছে, তিল ধারণের স্থান নেই কোথাও। তারপর আকাশের দিকে চোখ পড়ল সবার। লক্ষ লক্ষ হাত তুলে একজন আরেকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে প্যারাসুটের দিকে।

কনফারেন্স টেবিলে চরম উত্তেজনা। সবার আগে বিস্ফোরিত হলেন জেনারেল হিগিনস। স্ক্রীন থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন তিনি। প্রলয় নেমে আসছে রাজধানীর বুকে। তা ছড়িয়ে পড়বে গোটা মহাদেশে। থরথর করে কেঁপে উঠলেন তিনি। দু'হাত দিয়ে মাথার চুল খামচে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'শেষ!' কর্কশ শোনাল তার গলা। 'আমরা শেষ হয়ে গেলাম!'

'কিছুই কি করার নেই আমাদের?' স্ক্রীনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল হিগিনস। শরীরের দু'পাশে হাত দুটো শক্ত মুঠো পাকিয়ে গেছে। 'গুলি করে ধুলো করে দেয়া যায় ওটাকে, এক সেকেণ্ডও লাগবে না। কিন্তু বীজানুগুলো ছড়িয়ে পড়বে তাতে। এছাড়া আর কি করার আছে, আমি জানি না!'

ডেভিড মরগান দেখলেন, প্রেসিডেন্টের চোখে উপলব্ধির একটা উজ্জ্বলতা ফুটে উঠল। তিনিও বাস্তবের কাছে মাথা নত করছেন, উপলব্ধি করছেন পথের শেষে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা। এ অসম্ভব, ঘটতে পারে না, মেনে নেয়া যায় না, কিন্তু তবু সত্যি।

লক্ষ-কোটি মানুষের মৃত্যুর শুরু আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার, মাত্র অল্প কয়েকশো ফিট দূরে।

প্যারাস্ক্যুটের দিকে একাগ্র মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছেন সবাই। স্ক্রীনের এক কোণে ছোট্ট একটা কালো বিন্দু ফুটে উঠল, কিন্তু প্রথমে সেটা কারো চোখেই পড়ল না। একটু একটু করে আকারে বড় হচ্ছে বিন্দুটা। প্রথমে ওটাকে দেখতে পেলেন অ্যাডমিরাল মার্চ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ভুরু কুঁচকে এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, যেন লেযার রশ্মি বের করছেন চোখ দুটো থেকে। এতোক্ষণে আর সবাইও দেখতে পেল বিন্দুটাকে। আকার দেখে বোঝা গেল ওটা একটা হেলি-কপ্টার। সোজা তীরবেগে ছুটে আসছে ওয়রহেডের দিকে।

'হোয়াট ইন গড্স নেম...' শুরু করলেন জেনারেল হিগিনস।

'সেই 'কপ্টারইটাই না? আইওয়ার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে-ছিল যেটা? হ্যাঁ, সেটাই।' অ্যাডমিরাল বললেন।

'এবার হারামজাদাকে উচিত সাজা দেবো,' কমিউনিকেশন রিসিভারের দিকে হাত বাড়ালেন জেনারেল হিগিনস।

রোদ লেগে ঝলমল করছে হেলিকপ্টারের গা। আকারে আরো বড় হলো সেটা। গায়ে লেখা বড় বড় অক্ষরগুলো পড়া গেল এবার।

'নুমা,' বললেন অ্যাডমিরাল মার্চ। 'তার মানে ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার এ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির 'কপ্টার ওটা।'

দুহাতে মুখ ঢেকে বসে ছিলেন ডেভিড মরগান। হাত নামিয়ে এর-তার দিকে উদভ্রান্তের মতো তাকালেন তিনি,

যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলেন। 'নুমা? কে বলল নুমা?'

'স্ক্রীনে তাকান।'

তাকালেন মরগান। পরমুহূর্তে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন তিনি।

'হারামজাদাকে নিশ্চিহ্ন করার নির্দেশ দিচ্ছি,' মুখের সামনে রিসিভার তুললেন জেনারেল হিগিনস। 'গ্রাউণ্ড ট্রুপসকে বলো···

বোবা হয়ে গেছেন মরগান। চেঁচিয়ে উঠে নিষেধ করতে চাইলেন, কিন্তু গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরুল না। ছুটলেন তিনি।

কিন্তু তার দরকার ছিল না।

'না,' মৃদু গলায় বললেন প্রেসিডেন্ট।

'স্যার?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন হিগিনস।

'যা করছে করুক ওরা,' বললেন প্রেসিডেন্ট। উপস্থিতদের মধ্যে একমাত্র তিনিই জানেন নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন কোনো কাজে হাত দিলে কাজটার সমস্ত দিক বিবেচনা করেই হাত দেন। তাঁর ওপর অগাধ বিশ্বাস এবং আস্থা রাখেন প্রেসিডেন্ট।

মাঝপথে থমকে দাঁড়ালেন মরগান। প্রেসিডেন্টের কথা শুনে স্বস্তি বোধ করলেন তিনি। নুমার সাথে মাসুদ রানার একটা যোগাযোগ হয়েছে, জানা ছিল তার। স্ক্রীনের 'কপ্টারটার দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, এসবের পিছনে নিশ্চয়ই মাসুদ রানার কোন ভূমিকা আছে। ক্ষীণ একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন যেন

তিনি।

দ্রুত কমে আসছে 'কপ্টার আর ওয়রহেডের ব্যবধান।

উজ্জ্বল কমলা রঙের প্যারাস্যুটের দিকে বিদ্যুৎবেগে ছুটল মিনার্ভা। কিন্তু শেষ রক্ষা হবে কিনা সন্দেহ রয়েছে কর্ণেল রেজ্‌নিকের মনে।

কুইক-ডেথ ওয়রহেডের পতনের ধারা হিসেব করতে ভুল করেছিলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিটলন এবং রেজনিক। ন্যাশনাল আর্কিভ বিল্ডিঙের মাথার ওপর হেলিকপ্টার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রেজনিক, এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে খুলে গেল প্যারাস্যুট। মাঝখানে দূরত্ব ছিল তখন সিকি মাইল। মহা মূল্যবান কয়েকটা সেকেণ্ড নষ্ট হলো 'কপ্টারের নাক ঘোরাতে গিয়ে। তারপর ছুটল হেলিকপ্টার। কয়েক ঘণ্টা আগে রানা যে পরামর্শটা দিয়ে রেখেছে, সেটাই কাজে লাগাতে যাচ্ছে ওরা এখন।

'বারো সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল!' কেবিনের দরজা থেকে চাপা উত্তেজনার সাথে বললেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।

আর আঠারো সেকেণ্ড পর বিস্ফোরিত হবে ওয়রহেড। মাটি থেকে এক হাজার ফিটের মাথায়।

'হুক আর উইঞ্চে আমি রেডি হয়ে আছি,' বললেন অ্যাডমিরাল।

দ্রুত এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রেজনিক। 'বড় বেশি ঝুঁকি, স্যার। যা কিছু করার একবারের চেষ্টায় করতে হবে। গুঁতো মারতে চাইছি আমি। আর কোনো উপায় নেই। প্যারাশুটের

রশি আটকে নিয়ে উঠে যাবার চেষ্টা করব।

শিউরে উঠলেন অ্যাডমিরাল। সেই সাথে রেজনিকের বেপরোয়া দুঃসাহস মুগ্ধ করল তাঁকে। 'কিন্তু রোটর ব্লেডে রশি জড়িয়ে যাবে...'

'একটা মাত্র সুযোগ পাবো আমরা...মাত্র একবার...' বিড় বিড় করে বলল রেজনিক।

কথা যোগাল না অ্যাডমিরালের মুখে। দ্রুত এগিয়ে এসে কো-পাইলটের সীটে বসলেন তিনি। ব্যস্ত হাতে সীট-বেল্ট বেঁধে নিলেন।

উইণ্ডশিল্ডের সামনে ঝুলছে ওয়রহেড। গরল ভর্তি নীল রঙের লম্বাটে একটা মোড়ক। জোড়া টারবোশাফট্ ইঞ্জিনের থ্রটল ঠেলে দিল রেজনিক, একই সাথে টেনে পিছিয়ে আনল পিচ-কণ্ট্রোল কলাম।

অকস্মাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেল মিনার্ভার গতি। ঝাঁকিটা সামলে নিয়ে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বললেন, 'ছয় সেকেণ্ড।'

প্রকাণ্ড প্যারাসুটের ছায়া পড়ল 'কপ্টারের গায়ে। স্টারবোর্ড সাইডে কাত্ হয়ে গেল 'কপ্টার সামান্য, একটু দিক বদল করল রেজনিক।

দ্রুত এগিয়ে আসছে প্যারাসুটের মোটা রশিগুলো। মিনার্ভার সরু নাক ঢুকে গেল রশির ভিড়ে। কালো সিল্ক চুপসানো বেলুনের মতো নেতিয়ে পড়ল উইণ্ডশীল্ডের ওপর, ঢাকা পড়ে গেল সূর্য সহ সামনের সমস্ত আকাশ। তিনটে রশি পেঁচিয়ে গেল

রোটর শাফটের সাথে, কিন্তু পট্ পট্ করে ছিঁড়ে গেল সেগুলো। বাকি রশিগুলো ফিউজিলাজের সাথে জড়িয়ে গেল। টান পড়ল রশিতে। ঝাঁকি খেয়ে প্রায় স্থির হয়ে গেল মিনার্ভা। ভারি প্রজেক্টাইল এখন 'কপ্টারের সাথে ঝুলছে।

'দু'সেকেণ্ড!' অ্যাডমিরালের দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস শব্দ বেরিয়ে এলো।

ভারি শেলটা নিচের দিকে টানছে মিনার্ভাকে। পিচ কণ্ট্রোল কলামের সাহায্যে 'কপ্টারকে প্রায় লেজের ওপর খাড়া দাঁড় করিয়ে রেখেছে রেজনিক। বিরতিগুলোয় না থেমে পিছিয়ে আনল থ্রটল। পরমুহূর্তে হাতের দ্রুত এক ঝাপটা মেরে টান দিল কালেকটিভ পিচ লিভার।

ইঞ্জিন দুটো তাদের শেষ শক্তি বিন্দু দিয়ে লড়ছে, কিন্তু কিছু-তেই কিছু হচ্ছে না। সেকেণ্ড গোণার কাজ ছেড়ে দিয়েছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। সময় পেরিয়ে গেছে আঙুলের ফাঁক গলে। এক হাজার ফিটের ঘরে থরথর করে কাঁপছে অলটিমিটারের কাঁটা। খোলা একটা জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিয়ে তাকা-লেন তিনি। পত্ পত্ করে উড়ছে কমলা সিল্কের প্রান্ত। ওটাকে ছাড়িয়ে নিচে নেমে গেল দৃষ্টি। ফিউজিলাজের নিচে ঝুলছে ওয়রহেড। যে-কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে। একটা ঢোক গিলে মাথাটা টেনে নিলেন ভেতরে।

দ্রুত বাতাস কাটছে মিনার্ভার রোটর ব্লেডগুলো। প্যারাস্যুট, প্রজেক্টাইল আর ওয়রহেড একসাথে ঝুলছে।

ভয়ে ভয়ে অলটিমিটারের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল।

স্থির হয়ে আছে কাঁটা, একচুল নড়ছে না। তাঁর ঘন ভুরুর ভেতর চকচক করছে ঘাম।

দশ সেকেণ্ড নয়, অ্যাডমিরালের মনে হলো দশ বছর ধরে শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে মিনার্ভা। ওদিকে মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা সরিয়ে দিয়ে কণ্ট্রোলের সাথে যুদ্ধ করছে রেজনিক। নিজেকে এই প্রথম অক্ষম অসহায় বোধ করছেন অ্যাডমিরাল।

'ওঠো, দোহাই লাগে, ওঠো,' রেজনিকের আবেদনের সুরটা কেঁপে গেল।

সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল অলটি-মিটারের কাঁটার দিকে। হঠাৎ মনে হলো, এক হাজার ফুট লেখা চিহ্নের ওপর এক চুলের দশভাগের এক ভাগ ওপরে উঠল কাঁটাটা। দ্রুত এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি। না, নিশ্চয়ই ভুল দেখেছেন তিনি, চোখের ভুল···কিন্তু ওই যে! আবার! সন্দেহ নেই আর, কাঁটাটা নড়ছে। একটু একটু।

'আমরা উঠছি,' রুদ্ধ গলায় বললেন তিনি।

রিপোর্ট শুনল রেজনিক, জবাব দিল না।

ওঠার গতি বাড়ছে ক্রমশঃ। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল অলটিমিটারের দিকে। এখনও যেন সংশয়মুক্ত হতে পারছেন না।

কনফারেন্স রুমের ওঁরা সবাই ঝির ঝিরে শান্তির পরশ অনু-ভব করলেন। জীবনে তাঁরা কেউ এতো আনন্দ পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। এমন কি যার মুখে হাসি দেখা যায় না বললেই চলে,

সেই জেনারেল কার্ট হিগিনসও বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছেন। দম বন্ধ করা উত্তেজনাকর পরিবেশ, কেয়ামতের অশুভ কালো হাতছানি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে। মিনার্ভা টেনে নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের বীজ ভর্তি ওয়ারহেড, সেদিকে তাকিয়ে হাসছেন সবাই, দু'একজন হাততালি দিয়ে উৎসাহ যোগাচ্ছেন।

নিরাপদ দূরত্বে সরে যাচ্ছে মিনার্ভা।

চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা হাঁফ ছাড়লেন প্রেসিডেন্ট। একটা সিগার ধরালেন তিনি। ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে ডেভিড মরগানের দিকে তাকালেন. বললেন, 'নুমা কাজটা করতে পারবে, তা তুমি বুঝলে কিভাবে ?'

'বুঝিনি, স্যার,' বললেন মরগান। 'আন্দাজ করেছিলাম।'

'আন্দাজই বা করো কিভাবে ? অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে চেনো, পরিচয় আছে ?' অ্যাডমিরাল সম্পর্কে কেউ তেমন কিছু জানে না, অন্ততঃ কারো জানার কথা নয়, প্রেসিডেন্ট তাই পরীক্ষা করছেন মরগানকে।

'না, স্যার। তবে, মাসুদ রানাকে চিনি—অবশ্য মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পরিচয় হয়েছে তার সাথে। অনেক কথা জানি তার সম্পর্কে। বাংলাদেশের লোক। কবীর চৌধুরীর এক নম্বর দুষমণ। নুমার সাথে কি যেন একটা সম্পর্ক আছে তার।'

ক্ষীণ একটু ভুরু কুঁচকে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আচ্ছা !'

ফোনের রিসিভার তুললেন অ্যাডমিরাল মার্চ। 'নুমা 'কপ্টারের সাথে কানেকশন দাও।' অর্ডার করলেন তিনি।

'বিপদ কিন্তু কাটেনি এখনও,' বললেন হিগিনস। 'খুব বেশি ক্ষণ আকাশে থাকতে পারবে না ওরা।'

ভিউইং স্ক্রীনের পাশের একটা স্পীকার থেকে জানানো হলো, 'কানেকশন পাওয়া গেছে।'

নিজের ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল মার্চ। মিনার্ভার দিকে চোখ, হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন রিসিভার। 'জয়েন্ট চীফসের অ্যাডমিরাল টিমোথি মার্চ বলছি, নুমা 'কপ্টার, প্লীজ পরিচয় দিন।'

স্পষ্ট এবং শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো স্পীকারে। 'জর্জ হ্যামিলটন, মার্চ। কি চাও তুমি?'

দ্রুত সিধে হয়ে বসলেন প্রেসিডেন্ট। 'জর্জ নিজে?'

মাথা ঝাঁকালেন মার্চ। রিসিভারে বললেন, 'কি চাই? কি চাই মানে? তুমি জানো না কি চাই আমরা?'

'ঠিক যা চাইছ, যা চাওয়া উচিত, আমরা তাই করছি,' মিনার্ভা থেকে ভেসে এলো অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের শান্ত গলা। 'ভালো কথা, কুইক-ডেথ ওয়রহেডের বিপদ সম্পর্কে জানো তুমি?'

'জানি।'

'তাহলে তো বুঝতেই পারছ, কি করতে যাচ্ছি আমরা।'

'ব্যাখ্যা করো।'

'পাঁচ হাজার ফিট ওপরে উঠে যাচ্ছি আমরা,' স্পীকারে ভেসে আসছে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের শান্ত কণ্ঠস্বর। 'তারপর আমি আর কর্ণেল রেজনিক সাগরের দিকে যাবো। ফুয়েল যতক্ষণ

থাকবে, যেতেই থাকব আমরা। তারপর ওয়রহেডটা ফেলে দেবো পানিতে—তীর থেকে যতোদুরে সম্ভব।'

'ঠিক কতো দুর, বলতে পারো ?'

কয়েক সেকেণ্ডের বিরতি। রেজনিকের সাথে আলোচনা করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'ডেলাওয়্যার কোস্টলাইন থেকে পুব দিকে প্রায় ছয়শো মাইল।'

'শক্তভাবে আটকে আছে প্রজেক্টাইল ? পড়ে যাবার ভয় নেই ?'

'মনে হয় না। ভালোভাবেই পেঁচিয়েছে রশিগুলো,' বললেন হ্যামিলটন। 'তবে পুরোপুরি ইন্সট্রুমেন্টের ওপর ভরসা না করতে হলে ভালো হতো। অন্ততঃ···প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হতাম না আমরা।'

'কি! মানে ? আবার বলো।'

'প্যারাসুটের কাপড়,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'আমাদের উইণ্ডশিল্ড ঢেকে দিয়েছে। আমরা শুধু সোজা নিচের দিকটা দেখতে পাচ্ছি।'

'সাহায্য করতে পারি আমরা ?'

'অবশ্যই,' দ্রুত বললেন হ্যামিলটন। 'আমাদের পথ থেকে সমস্ত সামরিক আর বাণিজ্যিক ফ্লাইট ট্রাফিককে দূরে সরে থাকতে বলো।'

'ধরে নাও তোমার নির্দেশ কার্যকরী করা হয়েছে,' বললেন মার্চ। 'সেই সাথে আমি একটা উদ্ধারকারী জাহাজ পাঠাচ্ছি, তোমাদের গন্তব্যের কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করবে।'

'লাভ নেই, মার্চ। তোমাদের ইচ্ছাটা রেজনিক আর আমার জন্যে আনন্দদায়ক, কিন্তু কাজটা হবে বিপজ্জনক, শুধু শুধু কিছু লোক মারা যাবে। ওদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোনো মানে হয় না।' একটু বিরতি নিলেন। 'বুঝেছ, মার্চ?'

সাথে সাথে উত্তর দিতে পারলেন না মার্চ। তাঁর দু'চোখে ঘনিয়ে এলো গভীর বিষাদ। 'বুঝেছি,' প্রায় ফিসফিস করে বললেন তিনি। 'বুঝেছি, জর্জ। মার্চ আউট।'

ঝাড়া পনের সেকেণ্ড একটা শব্দ করল না কেউ। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর কণ্ঠস্বরে চাপা উত্তেজনার সাথে মিশে রয়েছে অবিশ্বাসের সুর। 'ওদেরকে বাঁচাবার কোনো উপায় নেই?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল মার্চ। 'তিক্ত সত্য হলো, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন এবং কর্ণেল রেজনিক আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন। ফুয়েল শেষ হয়ে গেলে হেলিকপ্টারটা সাগরে ডুবে যাবে। পানি থেকে এক হাজার ফিট ওপরে থাকতে বিস্ফোরিত হবে ওয়রহেড, বেরিয়ে আসবে কুইক-ডেথ বীজাণু বাকিটা আমরা অনুমান করে নিতে পারি।'

'কিন্তু কাপড়টা কেটে ফেলতে পারে না ওরা?' বললেন মরগান। 'তারপর ওয়রহেডটা ফেলে দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে পারে না?'

'অ্যাডমিরাল মার্চের বক্তব্য বুঝতে পারছি,' বললেন জেনারেল হিগিনস। 'উত্তরটা ভিউইং স্ক্রীনে রয়েছে। প্যারাসুটটাই কাল হয়েছে 'কপ্টারের। রোটরের গোড়ায় পেঁচিয়ে গেছে রশি-

গুলো, কয়েকটা ঝুলছে কার্গো দরজার উল্টো দিকে। 'কপ্টারটাকে শূন্যে দাঁড় করিয়েও কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় ওই ওপরে একটা ছুরি নিয়ে ওঠা—কোনো ভাবেই নাগাল পাবে না সে।

'হেলিকপ্টার সাগরে পড়ার আগে ঝাঁপ দিয়ে পানিতে পড়তে পারবে না ওরা?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন জেনারেল রড। 'অন্যান্য এয়ারক্রাফটের মতো নুমার কপ্টারে অটোমেটিক কণ্ট্রোল সিস্টেম নেই। পানিতে লাফিয়ে পড়লে ওদের গায়ের ওপরই পড়বে মিনার্ভা।'

'শূন্যে থেকে তুলে নিতে চেষ্টা করাও সম্ভব নয়। ঝুঁকি নিয়ে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে—হয়ত। কিন্তু আমার মনে হয় লাভ হবে না কোন।'

'তার মানে কিছু করার নেই আমাদের?' হতাশায় বিকৃত শোনাল মরগানের গলা।

মাথা নিচু করে সামনের টেবিলের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট। এক সময় মুখ তুললেন তিনি। 'তোমরা শুধু প্রার্থনা করো ওরা যেন তীর থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে ওয়রহেডটাকে।'

'তারপর?'

'তারপর অক্ষমের মতো বসে থাকব আমরা, দু'জন সাহসী বীরকে মরে যেতে দেখব।'

নয়

ভঙ্গি করল কবীর চৌধুরীকে লক্ষ্য করে লাফ দিচ্ছে, কিন্তু ডাইভ দিল রানা ডান দিকে। ডেকের ওপর দড়াম করে পড়ল ও। কানের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে কবীর চৌধুরীর বুলেট। ডেকে পড়েই শরীরটাকে গড়িয়ে একটা বাল্কহেডের আড়ালে চলে এলো রানা। পায়ের সাথে ধাক্কা খেয়ে আগেই চলে এসেছে কোল্ট অটোমেটিক। খপ করে সেটা ধরে ফেলল, পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। এক পা এগিয়ে বাড়িয়ে দিল হাতটা, গুলি করল দরজার দিকে। তারপর উঁকি দিয়ে তাকাল। কোথায় কবীর চৌধুরী?

আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটল রানা। প্রচণ্ড রাগে রক্ত চড়ে গেছে ওর মাথায়। শয়তানটাকে খুন করবে সে।

ফ্রন্ট ব্রিজ থেকে স্টোরে, স্টোর থেকে প্যাসেজে, এক প্যাসেজ থেকে আরেক প্যাসেজে—ঝড়ের বেগে ছুটলো রানা। ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে ও, অনেকটা দূরে। তবু আশা, নাগালের

বাইরে চলে যায়নি এখনো।

এক মিনিট পর মেইন ডেকে বেরিয়ে এলো রানা। চারদিকে কোথাও খুব বেশিদুর দৃষ্টি যায় না। সুপারস্ট্রাকচারে বাধা পেয়ে আটকে যাচ্ছে দৃষ্টি। কান পাতল। কোথাও কোনো পায়ের আওয়াজ নেই। শব্দ হলেও, শুনতে চাওয়া বোকামি। অনবরত গর্জন করছে মেশিনগান আর স্মল আর্মস। হঠাৎ, প্রায় চল্লিশ গজ দূরে ধরা পড়ে গেল রানার চোখে কবীর চৌধুরী। হাত তুলেই গুলি করল রানা।

আনন্দে নেচে উঠল মন। একটা ঝাঁকি খেল কবীর চৌধুরী। পরমুহূর্তে দড়াম করে পড়ে গেল ডেকের ওপর।

ছুটল রানা। কিন্তু তিন পা-ও এগোয়নি, স্প্রিঙের মতো লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী। একটু খোঁড়াচ্ছে, কিন্তু ছুটছে তীরবেগে। কাঠের পায়ে লেগেছে গুলিটা, ভেঙে গেছে সেটা। দ্রুত মেইন ব্রিজের পিছনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সে। গুলি করল রানা। কিন্তু লাগল কিনা বুঝতে পারল না ও। খোঁড়াতে খোঁড়াতে অদৃশ্য হয়ে গেল কবীর চৌধুরী।

ব্রিজের পিছনে এসে কাউকে দেখল না রানা। জাহাজের কিনারায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল ও। পানির গায়ে এক-রাশ বুদবুদ দেখা যাচ্ছে। এক সেকেণ্ড চিন্তা করল সে। পরমুহূর্তে বুঝতে পারল, পালাচ্ছে কবীর চৌধুরী। নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না রেখেই পারে না। লাফ দিল রানা নিচের দিকে। শয়তানটাকে এতো সহজে ছেড়ে দিতে রাজি নয় সে।

পানিতে পড়ার আগে নদীর দূর সীমানায় একটা বোট দেখল

রানা। দাঁড়িয়ে আছে, চলে যাচ্ছে, নাকি এদিকেই আসছে, বুঝতে পারল না।

অনেক ওপর থেকে ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল রানা। পড়েই নেমে গেল নদীর একেবারে তলা পর্যন্ত, তারপর আবার যখন ভেসে উঠতে শুরু করল, চোখ মেলে চারদিকে ঘোলা পানি ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না।

হাত আর পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটছে রানা। জানে, দেরি করে ফেলেছে সে। কিন্তু হাল ছাড়েনি এখনও। ঘোলা পানি থেকে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক তাকাল ও। এই সময় চোখে পড়ল স্নরকেল। ভালো করে দেখার সময়ও পেল না রানা, হঠাৎ পানিতে একটা আলোড়ন তুলে হুশ্ করে ছুটতে শুরু করল সেটা। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ভাটির দিকে।

দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর। শত্রু পালিয়েছে, পানির নিচে থেকে লাভ নেই আর। নদীর মোহনায় নিশ্চই কবীর চৌধুরীর জন্যে অপেক্ষা করছে সাবমেরিন। অর্থাৎ সত্যিই বেঁচে যাচ্ছে ও।

পানিতে একটা কম্পন অনুভব করল রানা। পানির ওপর মাথা তুলে বুক ভরে শ্বাস নিল ও। চোখ মেলতেই দেখল দ্রুত ওর দিকে এগিয়ে আসছে একটা পেট্রল বোট। এখনো বেশ দূরে রয়েছে সেটা। মাথার ওপর একটা হাত তুলে সিগন্যাল দিল ও। তারপর সাঁতরে এগোতে শুরু করল বোটের দিকে। ধীরে ধীরে গতি মন্থর হয়ে আসছে পেট্রল বোটের। আইওয়ার কাছাকাছি আসতে চায় না।

দশ মিনিট পর। পেট্রল বোটের ব্রিজে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা।

চোখ ঘুরিয়ে কাঁচ ভাঙা জানালা আর ভাঙা রেডিও অ্যান্টেনা দেখল ও। সামনে এসে দাঁড়াল প্রকাণ্ডদেহী এক লোক।

'আমি আর্নেস্ট বাকলার,' বলল সে। 'কোস্টগার্ড পেট্রল বোটের কমাণ্ডার। ডকে ফিরে যাচ্ছিলাম, এই সময় আমাকে জানানো হলো ভিলেন পালাচ্ছে আর একজন হিরো তাকে ধাওয়া করছে—দু'জনকেই উদ্ধার করে বোটে তোলো।'

'আমি মাসুদ রানা. সুমার সাথে কাজ করছি,' বলল রানা।

'কিন্তু ব্যাটলশিপে আপনি উঠলেন কি ভাবে?'

'উঠিনি। নেমেছি। আপনি আমার কাছ থেকে একটা রেডিও অ্যান্টেনা পাবেন।'

'আপনি!'

'ওটা একটা দুর্ঘটনা ছিল, রিপোর্ট করার সময় পাইনি। দুঃখিত।'

মইয়ের দিকে ইঙ্গিত করল বাকলার। 'কেবিনে চলুন। আপনার বিশ্রাম দরকার। ডকে আপনার জন্যে একজন ডাক্তার অপেক্ষা করছেন।'

নিচের কেবিনে নেমে এলো ওরা। রানার হাতে একটা ধূমায়িত কফির কাপ ধরিয়ে দিল বাকলার। তারপর একটা খোলা দরজার দিকে ফিরে সে তার কমিউনিকেশন অফিসারকে জিজ্ঞেস করল, 'সেই 'কপ্টারটার শেষ খবর কিছু পেলে?'

'চেসাপিক বে-র ওপরে রয়েছে এখনও, স্যার।'

চেয়ারে বসতে গিয়েও বসল না রানা। মুখ তুলে তাকাল। 'কোন্ হেলিকপ্টার?'

'কেন, নুমার,' বলল বাকলার। 'বাপের কালেও এমন বিদ· ঘুটে দৃশ্য· দেখিনি। আইওয়ার একটা শেল থেকে বেরিয়ে এলো প্যারাস্যুট, সেই প্যারাস্যুটটাকে 'কপ্টারের সাথে জড়িয়ে নিল পাইলট। বোকার হদ্দ ব্যাটা, নয়ত বদ্ধ পাগল—না হয়েই যায় না।

গোটা ব্যাপারটার তাৎপর্য অনুধাবন করতে ঝাড়া ছয় সেকেণ্ড সময় নিল রানা। 'থ্যাঙ্ক গড্!' বিড়বিড় করে বলল ও, পরমুহূর্তে বিস্ফোরণের মতো গলা থেকে বেরিয়ে এলো কয়েকটা শব্দ 'রেডিও! রেডিও দরকার। কোন্‌দিকে রেডিও রুম?'

এক পা পিছিয়ে গিয়ে ভালো করে তাকাল বাকলার রানার দিকে। 'তার মানে?'

'কথা নয়।' দ্রুত বলল রানা। 'এক সেকেণ্ডের এদিক ওদিকে সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের প্রতি-নিধি হিসেবে আমি আপনাকে অর্ডার করছি, রেডিওটা কোথায় দেখান আমাকে।'

রানার দৃষ্টি আর গলার আওয়াজে জরুরী একটা ভাব ফুটে উঠতে দেখল বাকলার। কিন্তু দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারল না সে। 'কিন্তু একজন সিভিলিয়ানকে সামরিক কমিউনিকেশন ব্যব-হার করতে দেবার নিয়ম নেই···'

'আমাকে দেরি করিয়ে দিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল মারছেন আপনি,' রূঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'আপনার এই অসহযোগিতার খবর দুনিয়ার সবার কানে যাবে। আমি আপনাকে অর্ডার করছি, রেডিও রুমে নিয়ে চলুন আমাকে।'

দ্বিধা কাটে না বাকলারের। কাঁধ ঝাঁকাল সে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল, 'বেশ, চলুন।'

উদ্বিগ্ন চোখে টেমপারেচার গজের দিকে তাকাল রেজনিক। একটু একটু করে লাল ঘরের দিকে এগোচ্ছে কাঁটাটা। আটলান্টিক কোস্টলাইন এখনো ষাট মাইল দূরে। প্রচণ্ড উত্তাপে টারবাইন বিয়ারিং কাজ বন্ধ করে দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

'রেডিওর কল লাইট দপ দপ করে জ্বলে উঠল কয়েকবার। ট্র্যান্সমিট বাটনটা অন করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'দিস ইজ হ্যামিলটন। গো অ্যাহেড।'

'আপনি নন, আমিই ব্রেকফাস্টের জন্যে আপনার অপেক্ষায় রয়েছি, অ্যাডমিরাল।'

'রানা!' বিশুদ্ধ বিস্ময়ে বললেন অ্যাডমিরাল। 'কোত্থেকে বলছ তুমি? কেমন আছো?'

'ভিজে গেছি, ঠক ঠক করে কাঁপছি ঠাণ্ডায়,' হেডফোনে ভেসে এলো রানার কণ্ঠস্বর। 'পেট্রল বোট থেকে বলছি।'

'আরেকটা ওয়রহেড?'

'অকেজো করা হয়েছে।'

'কুইক-ডেথ এজেন্ট?'

'নদীতে,' বলল রানা। 'আপনাদের অবস্থা, অ্যাডমিরাল?'

ধীর, শান্ত ভঙ্গিতে গোটা পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। বাধা না দিয়ে সবটুকু শুনল রানা। অ্যাডমিরাল থামতে মাত্র একটা প্রশ্ন করল ও।

'আকাশে আপনারা কতোক্ষণ থাকতে পারবেন ?'

'ফুয়েল যা আছে, টেনে-টুনে ত্বু'আড়াই ঘণ্টা থাকতে পারব,' বললেন হ্যামিলটন। 'কিন্তু জরুরী সমস্যা হলো ইঞ্জিনগুলোকে নিয়ে। গরম হয়ে গেছে ওগুলো। যে-কোনো মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে।'

'হুঁ,' বলল রানা। 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে প্যারা-স্ল্যাটের কাপড় ইন-টেক চেম্বারের খানিকটা ব্লক করে রেখেছে।'

'চমকপ্রদ পরামর্শের জন্যে কান খোলা রেখেছি। ত্বু' একটা দিতে পারো নাকি ?'

'বোধ হয় পারি,' বলল রানা। 'কান খোলা রাখুন। দেড় ত্বু'ঘণ্টার মধ্যে সাড়া পাবেন আবার। এর মধ্যে যতোটুকু সম্ভব ওজন কমিয়ে ফেলুন। সীট, টুলস না, থাকলেও চলে এমন প্রতিটি জিনিস ফেলে দিন 'কপ্টার থেকে। তারপর যা করতে হয় করুন, শুধু আমার সাড়া না পাওয়া পর্যন্ত আকাশে থেকে যান। রানা আউট।'

রেডিও বন্ধ করে লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার বাকলারের দিকে তাকাল রানা। 'তীরে পৌঁছে দিন আমাকে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'আট মিনিটের মধ্যে ডকে পৌঁচাচ্ছি আমরা,' বলল বাক-লার।

'আমার একটা এয়ারক্রাফট দরকার হবে।'

'আল্লাই জানে আপনার কথায় নেচে ভুল করছি কিনা,' গম্ভীর মুখে বলল বাকলার। 'এই উৎকট ঝামেলায় আপনার

ভূমিকা কি, তাও বুঝতে পারছি না। আমার তো মনে হয় আপনাকে গ্রেফতার করে চালান দেয়া উচিত আমার।'

রক্তচক্ষু মেলে বাকলারের দিকে তাকাল রানা। 'বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছেন আপনি, লেফটেন্যান্ট।' রেডিও অপারেটরের দিকে ফিরে তার কাঁধে টোকা মারল ও। 'নুমা হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করো। কুইক।'

'আমার পেট্রল বোটে দাঁড়িয়ে আপনি আমার সহকারীকে হুকুম করছেন!' কঠিন শোনাল বাকলারের কণ্ঠস্বর।

লোকটার একটা হাতে গুলি লেগেছে, তা নাহলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত রানা। এক পা সামনে এগোলো ও। 'আপনার সাহায্য পাবার জন্যে কি করতে হবে আমাকে?'

বাকলারের চোখে হত্যার নেশা ফুটে উঠল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার চোখে। তারপর কেঁপে উঠল তার চোখের পাতা, ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটল ঠোঁটে।'বলুন, "প্লীজ"।'

'প্লীজ,' মুচকি হাসল রানা।

ঠিক বার মিনিটের মাথায় একটা কোস্টগার্ড হেলিকপ্টারে উঠে বসল রানা।

ঝড়ের বেগে ওয়াশিংটনের দিকে ছুটছে 'কপ্টার।

দু'ঘণ্টা সময় যেন দুই শতাব্দীর সমান, ফুরোতেই চায় না। স্লটার বীচের কাছে ডেলাওয়্যার তীর-রেখা পেরিয়ে এলো মিনার্ভা। তীর থেকে আটলান্টিকের ওপর পাঁচ মাইল চলে এসেছে ওরা। মোটামুটি শান্ত আবহাওয়া, সামান্য কিছু কালো

মেঘ দেখা যাচ্ছে ওদের পথের সামনে।

ভাঙা যায়নি, আর একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস ছাড়া বাকি সব ফেলে দেয়া হয়েছে 'কপ্টার থেকে। হ্যামিলটনের অনুমান, প্রায় চারশো পাউণ্ড ওজন কমানো গেছে। ফুয়েল পুড়ে যাওয়ায় আরো কিছুটা হালকা হয়েছে মিনার্ভা। ভার কমে যাওয়ায় খানিকটা রেহাই পেয়েছে ইঞ্জিনগুলো, ফলে এখন আর মারাত্মক ভাবে গরম হয়েও উঠছে না।

ককপিট বাল্কহেডে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছেন হ্যামিলটন। সীটগুলোও খুলে ফেলে দিয়েছেন তিনি, শুধু রেজনিকেরটা ছাড়া। গত দু'ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন তিনি, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

'কোনো শব্দ···রানার কোনো সাড়া ?'

ইন্সট্রুমেণ্ট থেকে চোখ সরাল না রেজনিক। শুধু মাথা নাড়ল এদিক ওদিক। 'কোনো সাড়া নেই,' বলল সে। 'কিন্তু আর কিই-বা আশা করা যায় ? মিঃ রানা তো আর যাদুকর নন, তাঁর কাছে আলাদীনের চেরাগও নেই।'

'কিন্তু ওর সম্পর্কে আমি যদ্দুর জানি,' বললেন হ্যামিলটন, 'অসম্ভবকে সম্ভব করার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা আছে ওর।'

'এক্ষেত্রে নয়। এই পরিস্থিতিতে কারো কিছু করার নেই।' প্যানেল ক্লকের দিকে তাকাল রেজনিক। 'শেষবার কথা হবার পর দু'ঘণ্টা আট মিনিট পেরিয়ে গেছে। মিঃ রানা বোধহয় অনিবার্য ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন আমাদেরকে।'

তর্ক করার প্রবৃত্তি হলো না অ্যাডমিরালের। হাত বাড়িয়ে হেড সেটটা তুলে নিয়ে কানে আটকালেন তিনি। চোখ বুঁজে

পড়ে রইলেন চুপচাপ। কোমল একটা প্রশান্তির পরশ অনুভব করলেন, ছেলেমেয়েদের চেহারা ভেসে উঠছে চোখের সামনে। সবাই বড় হয়েছে, সবাইকে তিনি মানুষ করে ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর অনুপস্থিতি সাময়িক একটা দুঃখ হয়ে বাজবে ওদের বুকে, কিন্তু ওরা কেউ কোনো অসুবিধেয় পড়বে না···

'এই যে, ভায়া, মিঃ রেজনিক, আপনাদের সব খবর কি?'

চমকে উঠল রেজনিক। গলার স্বরে নিখাদ বিস্ময় আর উল্লাস।

'মিঃ বেন। মিঃ বেন নেলসন! ইয়াল্লা, কোত্থেকে!'

"ট্র্যান্সমিট" বাটনটা অন করলেন অ্যাডমিরাল। 'বেন?'

'ইয়েস, স্যার।'

'কোথায়?'

'আধ মাইল পিছনে,' স্পীকারে ভেসে এলো বেন নেলসনের কণ্ঠস্বর। 'মিনার্ভার দুশো ফিট নিচে।'

ঘাড় ফিরিয়ে অ্যাডমিরালের চোখে তাকাল রেজনিক। কথা হলো না।

'তোমার না হাসপাতালে থাকার কথা?' প্রশ্ন করলেন অ্যাডমিরাল।

'ডাক্তারদের চোখে ধুলো দিয়ে আমাকে ফুসলিয়ে বের করে নিয়ে এসেছে রানা,' বলল বেন।

'কোথায় মিঃ রানা?' জানতে চাইল রেজনিক।

'আপনার শিরদাঁড়ার শেষ গিঁটের দিকে তাকিয়ে,' বলল রানা, 'একটা 'কপ্টারের কন্ট্রোলে বসে রয়েছি।'

'দেরি করে ফেলেছেন, মিঃ রানা।'

'দুঃখিত। ঝামেলার কাজ, সময় লাগে। ফুয়েলের কি অবস্থা?'

'ট্যাংকের তলা ছেঁচে আরো কিছু ফোঁটা পেতে পারি,' গম্ভীর সুরে বলল রেজনিক। 'ভাগ্য সহায়তা করলে আর বড় জোর আঠারো থেকে বিশ মিনিট টিকতে পারব।'

'বিশ মাইলের মধ্যে একটা নরওয়েজিয়ান ক্রুজ লাইনার অপেক্ষা করছে—বিয়ারিঙ টু-সেভেন-জিরো ডিগ্রীজ। আপনাদেরকে রিসিভ করার জন্যে সমস্ত প্যাসেঞ্জারকে সান ডেক থেকে সরিয়ে দিয়েছে ক্যাপ্টেন। কোর্স বদলে রওনা হয়ে যান···'

'পাগল হয়েছেন!' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল রেজনিক। 'ক্রুজ শিপ···সান ডেক — এসব কি প্রলাপ বকছেন?'

আগের মতোই শান্ত স্বাভাবিক গলায় বলল রানা, 'রশি কেটে প্রজেক্টাইলটা আমরা ফেলে দিলেই আপনি 'কপ্টার নিয়ে ক্রুজ শিপে চলে যাবেন। ওটাকে খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধেই হবে না আপনার। মিনার্ভাকে থামান।'

'আপনাদের ভাগ্য! রীতিমতো ঈর্ষা হচ্ছে আমার। জাহাজের ক্যাপ্টেন রাজকীয় ব্রেকফাস্ট নিয়ে অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্যে,' বলল বেন।

বেন থামতেই চেঁচিয়ে বলল রেজনিক, 'ব্রেকফাস্ট! হায় আল্লা, ওরা দুজনেই পাগল হয়ে গেছে!' শূন্যে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে সে মিনার্ভাকে।

কো-পাইলটের সীটে বসে রয়েছে বেন, তার দিকে তাকাল রানা। ইঙ্গিতে প্লাস্টার মোড়া একটা পা দেখিয়ে জানতে চাইল,

'ওই পা নিয়ে কন্ট্রোলের দায়িত্ব নিতে পারবে তো?'

'চুলকানো ছাড়া বাকি সব পারব।'

'তোমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি তাহলে।' কন্ট্রোল কলাম থেকে হাত সরিয়ে নিল রানা। সীট ছেড়ে এগিয়ে গেল কার্গো সেকশনের দিকে। হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে খোলা হ্যাচ দিয়ে। রঙচঙে আলখাল্লা পরে প্রৌঢ় এক লোক সামনে কালো একটা চারকোণা মেশিন নিয়ে বসে রয়েছেন। 'আপনি রেডি, ডঃ গল?'

'এক মিনিট,' বললেন ডঃ গল। 'কুলিং টিউবগুলো হুকে আটকে নিলেই হাতের কাজ শেষ হয়ে যাবে। মাথা আর পাওয়ার সাপ্লাইয়ের চারদিকে পানি সরবরাহ না করতে পারলে ইউনিটটা অকেজো হয়ে যাবার ভয় আছে।'

'আমি কিন্তু আরো শক্তিশালী কিছু একটা আশা করেছিলাম,' মৃদু গলায় বলল রানা।

'লার্জ-ফ্রেম অ্যারগন লেযার এটা। সায়েন্স ফিকশনে ওরা যেটা দেখায় তার কোনো অস্তিত্ব নেই বাস্তবে। চিন্তার কিছু নেই, এটা দিয়ে বাস্তব সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যায়।'

'পাওয়ার?'

'ক্ষুদে একটা বীমে আঠারো ওয়াট জমাট বেঁধে থাকে, রিলিজ করে দুই কিলোওয়াট এনার্জি—খুব বেশি নয়। তবে কাজ চলে যাবে।'

'প্রজেক্টাইলের কতোটা কাছে যেতে হবে 'কপ্টারকে?'

'যতোটা কাছে সম্ভব—পনের ফিটের কম নয়।'

মাইকের বোতামে চাপ দিল রানা। 'বেন?'

'বলো।'

'প্রজেক্টাইলের পনের ফিটের মধ্যে নিয়ে চলো 'কপ্টার।'

'সে কি! অতো কাছে গেলে মিনার্ভার রোটর...'

'উপায় নেই,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'রোটর ব্লেডের বাতাস আমাদেরকে উল্টে দেবে বলে মনে করি না।'

লেযারের মেইন সুইচটা শেষবারের মতো পরীক্ষা করলেন ডঃ গল।

'শুনছেন, কর্ণেল?' বলল রানা।

'বলুন, মিঃ রানা।'

'বেন মিনার্ভার যতোটা সম্ভব কাছে যাচ্ছে। একটা লেযার বীমের সাহায্যে প্যারাস্যুটের রশি ছিঁড়ে প্রজেক্টাইলটাকে ফেলে দিতে চাই আমরা।'

'বুঝলাম!' বললেন অ্যাডমিরাল।

'পজিশন নিতে যাচ্ছি আমরা,' শান্তভাবে বলল রানা। 'স্টেডি অন কোর্স।'

ঘড়ি মেরামতকারীর ধৈর্য আর নৈপুণ্য নিয়ে 'কপ্টারটাকে মিনার্ভার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল বেন। মিনার্ভার একটু নিচে শূন্যে স্থির হয়ে দাঁড়াল 'কপ্টার।

কার্গো সেকশন। ডঃ গলের দিকে তাকাল রানা। তারপর উঁকি মেরে প্রজেক্টাইলটা দেখল। বারবার, দ্রুত দৃষ্টি ফেরাচ্ছে ও।

নুমার হেড ফিজিসিস্ট ডঃ গল ঝুঁকে পড়লেন লেযারের

মাথার দিকে। ভয় বা উদ্বেগের চিহ্ন মাত্র নেই তাঁর চেহারায়। রানার মনে হলো, কাজ করে দারুণ মজা পাচ্ছেন ভদ্রলোক।

'কই, কোনো বীম তো দেখতে পাচ্ছি না!' বলল রানা। 'কাজ করছে না নাকি?'

'ধারণাটাই ভুল,' বললেন গল। 'অ্যারগন লেযার বীম হচ্ছে ইনভিজিবল।'

'কিন্তু তাক করছেন কিভাবে?'

'এই যে, ত্রিশ ডলারের টেলিস্কোপিক রাইফেল সাইটের সাহায্যে,' গোল টিউবটার গায়ে টোকা মারলেন গল।

উপুড় হয়ে শুয়ে মাথাটা খোলা হ্যাচের বাইরে বের করে দিয়েছে রানা। বাতাসে চুল উড়ছে তার। মিনার্ভার নিচে ঝুলছে প্রজেক্টাইল। ওটার দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না, এতোটুকুন একটা প্যাকেজের ভেতর একটা মহাদেশের সমস্ত প্রাণী ধ্বংস করার বীজ থাকতে পারে।

'আরো কাছে নিয়ে চলো, বেন!' হাঁক ছাড়লেন গল। 'আরো দশ ফিট।'

'দশ ফিট কাছে নিয়ে চলো,' মাইক্রোফোনে বেনকে নির্দেশ দিল রানা।

'কিন্তু ··আরো কাছে গেলে মিনার্ভার রোটর ব্লেড কচুকাটা করবে যে··' বিড়বিড় করছে বেন। কিন্তু চেহারায় উদ্বেগ বা ভীতির চিহ্ন মাত্র নেই। শুধু দরদর করে ঘামছে সে। চোখে ক্ষুরধার দৃষ্টি।

এতোক্ষণে একটা পরিবর্তন ধরা পড়ল রানার চোখে। প্রজে-

ক্টাইলের ওপরের রশিগুলোর রঙ বদলে কালচে হয়ে গেছে। অদৃশ্য লেযার বীম নাইলনের রশিগুলোকে ধীরে ধীরে পুড়িয়ে ফেলছে। রশির ভিড়ের দিকে রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে ও। সংখ্যায় কতো ওগুলো! পঞ্চাশটা, নাকি আরো বেশি?

'মেশিনটা গরম হয়ে গেছে!' একটা হাহাকার ধ্বনির মতো শোনাল ডঃ গলের কথাগুলো।

ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। এটাই শেষ ভরসা। এতেও যদি কাজ না হয়, ওদেরকে বাঁচাবার উপায় কি!

'বড় বেশি ঠাণ্ডা এখানে,' আবার বললেন গল। 'কুলিং টিউবগুলো জমাট বেধে গেছে।' টেলিস্কোপিক সাইটে চোখ রাখলেন আবার।

রানা দেখল, কয়েকটা রশি ছিঁড়ে গিয়ে ঝুলে পড়েছে প্রজেক্টাইলের নিচে। পোড়া কটু গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে 'কপ্টারের ভেতরের বাতাস।

মন্থর গতিতে আরো আট দশটা রশি পুড়ল। কিন্তু বাকিগুলো টান টান হয়ে রয়েছে এখনও।

অকস্মাৎ উঠে দাঁড়ালেন গল। হাতের দস্তানা খুলে ফেললেন তিনি। 'আমি দুঃখিত, মিঃ রানা। লেযার কাজ করছে না।'

এখনো ঝুলছে প্রজেক্টাইল। ঝাড়া বিশ সেকেণ্ড নড়ল না রানা। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'আর কারো কিছু করার নেই,' স্পীকারে অস্বাভাবিক শান্ত শোনাল অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের গলা। 'যথেষ্ট করেছ তুমি, রানা। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'গু-ড-বা-ই, মিঃ রানা,' হতাশায় ফিসফিস করে বলল কর্ণেল।

কিন্তু ওদের কথা যেন কানেই যায়নি রানার। শান্ত, সহজ গলায় বলল, 'ডাইভ দিন, কর্ণেল। তারপর আচমকা নাক তুলে ওপরে উঠুন।'

'কি! কি বললেন!'

'এটাই আপনাদের শেষ আশা। নাক নিচু করে ডাইভ দিন। ফুল স্পীডে। রশিগুলোয় ঢিল পড়বে। তখন নাক ওপর দিকে তুলে উঠতে শুরু করবেন। প্রচণ্ড টান পড়বে রশিতে। ছিঁড়ে যাবে ওগুলো। সময় নেই, তাড়াতাড়ি করুন। ডাইভ দিন।

মৃদু হাসির শব্দ ভেসে এলো রেডিও স্পীকারে। 'পণ করেছ বাঁচাবেই, তাই না? কিন্তু পারবে বলে মনে হয় না, রানা।'

'দেখা যাক,' শান্তভাবে বলল রানা। 'কর্ণেল, ডাইভ দিন।'

'কিছুই দেখতে পাচ্ছি না সামনে,' বলল রেজনিক। । 'শুধু ইন্সট্রুমেন্টের ওপর নির্ভর করে...'

'অযথা সময় নষ্ট করছেন আপনি!' ধমকে উঠল রানা। 'যা বলছি করুন। আপনাদের পিছনে থাকছি আমরা।'

কন্ট্রোল স্টিক সামনে ঠেলে দিল রেজনিক।

সত্তর ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ডাইভ দিল মিনার্ভা। শুয়ে আছেন অ্যাডমিরাল, পা বাধিয়ে রেখেছেন রেজনিকের সীটের গোড়ায়। মিনার্ভার নাক সাগরের দিকে তাক করা, তীরবেগে নেমে যাচ্ছে সে।

চার হাজার ফিট।

মিনার্ভাকে অনুসরণ করছে বেনের 'কপ্টার, কিন্তু বেশ খানিক-টা পিছনে থেকে।

অলটিমিটার আর এয়ারস্পীড ইণ্ডিকেটরের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে কর্ণেল রেজনিক।

তিন হাজার ফিট।

বনবন করে ঘুরছে মিনার্ভার রোটর ব্লেড। নিজেদের 'কপ্টার থেকে দেখল রানা, কমলা রঙ প্যারাস্যুটের কাপড় পতাকার মতো পতপত করে উড়ছে, ছুঁই ছুঁই করছে রোটরের ব্লেড। তবু চুপ করে থাকল ও, রেজনিকের মাথায় এমনিতেই হাজারটা চিন্তা, আরেকটা বিপদের কথা জানিয়ে তাকে বিচলিত করার কোনো মানে হয় না।

থরথর করে কাঁপছে মিনার্ভা। গতি বাড়ার সাথে সাথে শুরু হয়েছে বাতাসের তাণ্ডব। কন্ট্রোল সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে কর্ণেল রেজনিক। মুহূর্তের জন্যে তার মনে হলো স্টিকটাকে পজিশনে স্থির রেখে এই নিষ্ঠুর যাতনার সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়া যাক। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে, সারাদিনে এই প্রথম, স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে-দের কথা মনে পড়ে গেল তার। ওদেরকে আবার দেখতে পাবার আকুল ইচ্ছেটা অকস্মাৎ সমগ্র অস্তিত্বে আগুন ধরিয়ে দিল যেন। বিড় বিড় করে প্রতিজ্ঞা করল সে, 'আমাকে বাঁচতে হবে!'

'হ্যাঁ, এইবার.' এয়ারফোনে বজ্রনির্ঘোষের মতো শোনাল রানার কণ্ঠস্বর। 'পুল আউট!'

হ্যাঁচকা টান দিয়ে স্টিকটা পিছিয়ে আনল রেজনিক।

দু'হাজার ফিট।

আকাশের দিকে নাক উঁচু করল মিনার্ভা। উঠতে শুরু করল ওপর দিকে। ঢিল পড়েছিল রশিতে, হঠাৎ প্রচণ্ড টান পড়ল। রশির শেষ মাথায় ঝুলন্ত ভারী প্রজেক্টাইল রশির টানে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ওপর দিকে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, উঠে এসে প্রচণ্ড ধাক্কা মারতে যাচ্ছে সেটা মিনার্ভার পেটে।

আঁতকে উঠল রানা।

আবার নেমে গেল প্রজেক্টাইল। আবার একটা ঝাঁকি খেল রশিগুলো। কিন্তু হতাশায় মুষড়ে পড়ল রানা। একটা রশিও ছেঁড়েনি। শেষ প্রান্তগুলোয় এখনও ঝুলছে প্রজেক্টাইল।

স্পীড কমিয়ে আনল রেজনিক। কিন্তু থামল না। কেউ কথা বলছে না ওরা।

প্রথমে নিস্তব্ধতা ভাঙলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। আর মাত্র কয়েকটা মিনিট বাকি, তারপর সব শেষ। কিন্তু তার কথার সুরে কৌতুকের ক্ষীণ রেশ ফুটে উঠল। 'যাদুকরের হাতে আর কোনো খেলা আছে নাকি দেখাবার মতো?'

শুনল রানা, কিন্তু সাড়া দিল না। স্তব্ধ হয়ে গেছে ও। মাথার ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। তবে কি মেনে নিতে হবে পরাজয়? চোখের সামনে আত্মহত্যা করতে দেবে দু'জন মহৎ হৃদয় মানুষকে? কোনো উপায় নেই?

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল বেন। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল রানা।

'আর এগারো মিনিট বাকি,' স্পীকারে ভেসে এলো কর্নেলের

গলা। 'তারপরই ফুয়েল শেষ হয়ে যাবে। মিঃ রানা, অনুসরণ করার দরকার নেই আর। অসংখ্য ধন্যবাদ। রেজনিক আউট।'

'শূন্যে দাঁড় করান মিনার্ভাকে,' অদ্ভুত শান্ত গলায় বলল রানা।

'কিন্তু...'

'দ্যাটস অ্যান অর্ডার!' বাঘের মতো গর্জে উঠল রানা।

'কি করতে চাইছ, রানা?' বিমূঢ় বিস্ময়ের সাথে জানতে চাইল বেন।

শূন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল মিনার্ভা।

'মিনার্ভার ত্রিশ ফিট ওপরে,' বলল রানা, 'রোটর ব্লেডের কিনারা বাঁচিয়ে যতোটা কাছাকাছি সম্ভব থামাও 'কপ্টার। দড়ির মই বেয়ে নামব আমি। রেডিও মেসেজ পাঠাও ক্রুজ শিপকে। ফুল স্পীডে আসতে বলো এদিকে। কুইক!'

'রানা!'

রেজনিককে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানাল রানা।

'অসম্ভব!' তীব্র প্রতিবাদের সুরে মিনার্ভা থেকে বললেন অ্যাডমিরাল। 'তুমি আত্মহত্যা করতে চাইছ। এ আমি হতে দেবো না।'

'আমাকে আপনি অপমান করছেন, অ্যাডমিরাল,' কঠিন শোনাল রানার গলা। 'কি করতে যাচ্ছি, ভালোই জানা আছে আমার। তুটো 'কপ্টার নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকবে। নাই লনের সিঁড়ির শেষ প্রান্তে ঝুলব আমি। দোল খাবো। প্যারা-স্যুটের রশি নাগালের মধ্যে না আসার কোনো কারণই নেই।'

’কপ্টার দাঁড় করাল বেন। তারপর ধীরে ধীরে, একটু একটু করে মিনার্ভার দিকে এগোল।

পনের ফিট দুরত্ব বাকি থাকতে স্থির হলো ’কপ্টার।

নাইলনের সিঁড়ি নামিয়ে দিয়েছেন ডঃ গল। কোনো কথা বললেন না, খাপ সহ একটা ছুরি রানার বেল্টে গুঁজে দিয়ে ওর পিঠ চাপড়ে দিলেন তিনি।

‘রানা···’ অ্যাডমিরাল কি যেন বলছেন মিনার্ভা থেকে। কান দিল না রানা।

ছ’হাজার পাঁচশো ফিট নিচে আটলান্টিকের ঢেউগুলোকে ছোটো ছোটো দেখাচ্ছে। বাতাসে দোল খাচ্ছে নাইলনের সিঁড়ি। শেষ প্রান্তে ঝুলছে রানা। ডঃ গল হুইল ঘুরিয়ে একটু একটু করে নামিয়ে দিচ্ছেন ওকে।

মিনার্ভার দুটো জানালায় দেখা গেল দুটো উদ্বেগাকুল মুখ। মাথার ওপর হাত তুলে সিগন্যাল দিল রানা। স্থির হয়ে গেল সিঁড়ি।

পঞ্চাশ ফিট লম্বা সিঁড়ির গোড়ায় ঝুলছে রানা। বাতাসের অনুকূলে দোল খেতে শুরু করল ও।

মাথার ভেতর শুধু একটাই চিন্তা। দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে মিনার্ভার ফুয়েল।

দোলের পরিধি ক্রমশঃ বাড়ছে। প্রজেক্টাইলের কাছাকাছি এসে আবার ফিরে যাচ্ছে ও। এখনো পাঁচ ফিটের মতো কমাতে হবে দুরত্ব। আবার আসছে ও।

প্রজেক্টাইলের রশিগুলো এবারও সাড়ে চার ফিট দুরে রয়ে

গেল।

চিৎকার করছেন অ্যাডমিরাল। কি যেন বলতে চাইছেন তিনি। প্রজেক্টাইলের দিকে আবার দ্রুত এগোল রানাকে নিয়ে সিঁড়িটা। মুখ তুলে তাকাল রানা। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা। মিনার্ভার রোটর ব্লেডের সাথে আরেকটু হলে বাড়ি খেতে যাচ্ছিল সিঁড়ির রশি।

আবার আসছে রানা। এবারই যা করার করতে হবে। এর পরে ব্লেডের সাথে নির্ঘাৎ ধাক্কা খাবে সিঁড়ির ওপরের অংশ। তাহলে ঝুপ করে প্রায় আড়াই হাজার ফিট নিচে নেমে যাবে সে।

সোঁ সোঁ করে বাতাস কেটে এগোল রানা। জানে, চার ফিটের মতো দূরে থাকবে প্যারাস্যুটের রশিগুলো, নাগালের মধ্যে পাবে না ওগুলোকে। অপরদিকে এটাই তার শেষ সুযোগ।

দোলের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছুল সিঁড়ি। স্ট্র্যাপটা আগেই খুলে ফেলেছে রানা। সামনে বাড়িয়ে দিল দুই হাত। ঝাঁপিয়ে পড়ল শূন্যে।

জানালা দিয়ে মাথা বের করে তাকিয়ে রয়েছে বেন। উদ্বেগের কোনো চিহ্ন নেই চেহারায়।

আঁতকে উঠল রেজনিক। দুই 'কপ্টারের মধ্যবর্তী শূন্যে দেখল সে রানাকে, চোখ বুঁজে ফেলল। থরথর করে কাঁপছে শরীর।

রানা ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে বুঝতে পেরেই ছ্যাঁৎ করে উঠল অ্যাডমিরালের বুক। রানাকে চেনেন তিনি। কিন্তু সে

চেনায় যেন অসম্পূর্ণতা ছিল। আজ আবার নতুন করে চিনলেন তিনি। তাকিয়ে থাকলেন নিষ্পলক চোখে। বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো প্যারাস্যুটের রশিগুলো ধরতে পারল না রানা। কিন্তু পর মুহূর্তে সারা শরীরে স্বস্তির পরশ অনুভব করলেন। প্রজেক্টাইলের কয়েক ফিট ওপরে প্যারাস্যুটের রশি ধরে ফেলেছে রানা।

রশি ধরে ফেলল রানা, হড় হড় করে নেমে গেল দু'ফিট, তারপর স্থির হলো। পায়ের আঙুল থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি নিচে রয়েছে প্রজেক্টাইলের মাথা।

একটা নাইলনের রশি কোমর আর বুকে পেঁচিয়ে নিয়ে ঘাড়ের পিছনে সরিয়ে দিল রানা, মাথার পিছনটা টানটান রশিটার গায়ে ঠেকিয়ে স্থির করল শরীরটাকে। বাঁ হাতে ধরে আছে মাথার ওপরে সেই রশিটাই। ডান হাত দিয়ে বেল্ট থেকে বের করল ছুরি।

ঝুঁকে পড়ল রানা। হাঁটুর কাছে রশিগুলো ছুরি চালিয়ে একটা একটা করে কাটতে শুরু করল ও।

ধারাল ছুরি। কিন্তু নাইলনের রশিগুলো সাংঘাতিক পিচ্ছিল আর শক্ত। অনেক কষ্টে ছুরি বসাল রানা।

দ্রুত বয়ে যাচ্ছে সময়। মাত্র তিনটে রশি কেটেছে রানা, এখনো পাঁচটা বাকি। ওপর থেকে কে যেন কি বলছে, কিন্তু সেদিকে খেয়ালই নেই ওর। হয়ত ফুয়েল শেষ হবার ভয়ংকর দুঃসংবাদ জানাচ্ছেন হ্যামিলটন। শুনে লাভ নেই এখন কোনো। অ্যাডমিরাল আর রেজনিকের ভাগ্যের সাথে ওর ভাগ্যও এক

সুতায় গাঁথা হয়ে গেছে। ফুয়েল শেষ হয়ে গেলে…মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা সরিয়ে দিয়ে ছুরি চালাল ও। কিন্তু চিন্তাস্রোত থামল না। কতোক্ষণ হলো 'কপ্টার থেকে নেমেছে সে? পাঁচ মিনিট? নাকি দশ মিনিট? আর মিনিট খানেক চালু থাকবে মিনার্ভা?

আর একটা। আর মাত্র একটা রশি কাটতে হবে। অর্ধেকটা কাটা হয়ে গেছে।

বাকি অর্ধেকটা আর কাটতে হলো না রানাকে। ওয়রহেডের ভর সইতে না পেরে পট্ করে ছিঁড়ে গেল সেটা। নিচের দিকে তাকাল রানা। তীর বেগে নেমে যাচ্ছে ধ্বংসের বীজ ভর্তি প্রজেক্টাইল। হাঁপ ছাড়লেন হোয়াইটহাউসের দর্শকবৃন্দ।

হাঁপাতে হাঁপাতে ওপর দিকে তাকাল রানা। সমস্ত সন্দেহ দুর হয়ে গেল মন থেকে। ফুয়েল এখনও শেষ হয়নি। শেষ হলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে এভাবে হাসতে পারতেন না।

হাত নেড়ে সিগন্যাল দিল রানা। তৈরি হয়েই ছিল রেজ-নিক। তার চোখ দিয়ে হুহু করে পানি গড়াচ্ছে। কিন্তু সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই। কন্ট্রোল কলামের ওপর উড়তে শুরু করল তার হাত।

ছুটল মিনার্ভা। নিচে প্যারাস্যুট রশির শেষ প্রান্তে ঝুলছে রানা।

মাত্র ছয় মাইল দুরে দেখা যাচ্ছে নরওয়েজিয়ান ক্রুজ শিপ।

আস্তিন দিয়ে চোখ মুছে ফুয়েল ইণ্ডিকেটরের দিকে তাকাল

রেজনিক। স্পীড কমিয়ে আনল মিনার্ভার। এখনও যা ফুয়েল আছে, আরও দশ মাইল যেতে পারবে ওরা।

জানালা দিয়ে মাথা বের করে নিচে, রানার দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল রানাও। গায়ের পোশাক, চুল বাতাসে উড়ছে ওর। চোখাচোখি হতেই হাসল ও। তারপর মাথা ঘুরিয়ে সামনে তাকাল।

কিন্তু রানার দিকে এখনও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। আশ্চর্য। আশ্চর্য। অদ্ভুত একটা ছেলে।

দশ

কয়েক ঘণ্টা পরের কথা। হোয়াইট হাউস।

গভীর মনোযোগের সাথে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের কথা শুনছেন প্রেসিডেন্ট। মুখোমুখি দুটো সোফায় বসে আছেন তাঁরা। দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর এই বিশেষ সাক্ষাৎকারে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি উপস্থিত নেই।

কথা শেষ করে থামলেন অ্যাডমিরাল। একটা চুরুট ধরালেন তিনি।

'তার মানে বিপদের সম্ভাবনা রয়েই গেল,' চিন্তিত ভাবে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কবীর চৌধুরীকে ছোটো করে দেখে মারাত্মক ভুল করেছে সি. আই. এ। এ-ব্যাপারে আমি একটা তদন্তের নির্দেশ দেব। কিন্তু, জর্জ, লোকটাকে ধরার উপায় কি বলো তো?'

'আবার নতুন কোনো বিপদের কারণ না ঘটানো পর্যন্ত তাকে না ঘাঁটালেই ভালো হয়,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'মাসুদ

রানার সাথে আমার যোগাযোগ তো থাকছেই, কবীর চৌধুরীর ওপর তীক্ষ্ণ নজর আছে ওর। কবীর চৌধুরী আবার কোন মতলব আঁটলে জানতে পারব আমি।

রিস্টওয়াচ দেখলেন প্রেসিডেন্ট। যা ঘটে গেল, এর প্রতি-ক্রিয়া ভয়ংকর হয়ে দেখা দিতে পারে। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার আগে কয়েকটা জরুরী পদক্ষেপ নিতে হবে তাঁকে। ফুল কেবিনেট মিটিং বসতে যাচ্ছে দশ মিনিটের মধ্যে। এরই মধ্যে নিউজ মিডিয়াগুলো যার যা খুশি গুজব রটাতে শুরু করে দিয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা অন্য এক রঙে পরিবেশন করতে হবে, যাতে স্বস্তি পায় দেশের মানুষ, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদাও অক্ষুণ্ণ থাকে।

'দুঃখিত, আরো একটা কথা বলা হয়নি আপনাকে, মিঃ প্রেসিডেন্ট,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন স্কট মারা গেছেন। অসুস্থ শরীরে ট্রুথ সেরামের ডোজ সহ্য করতে পারেননি তিনি।'

বিষাদের ছায়া পড়ল প্রেসিডেন্টের চেহারায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, 'আশ্চর্য বলিষ্ঠ এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি, সন্দেহ নেই। এতোগুলো বছর কুইক-ডেথ রহস্য চেপে রাখা আর কারো পক্ষে সম্ভব হতো কিনা জানি না। যাই হোক, সব ভাল যার শেষ ভালো। মহা-ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেছি আমরা।'

'রঙ্গেলো আইল্যাণ্ড এখনো রয়েছে, মিঃ প্রেসিডেন্ট,' স্মরণ করিয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'হ্যাঁ,' ওপর নিচে মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট। 'বিষাক্ত ক্ষতটা রয়ে গেল।'

'কুইক-ডেথের অবশেষ রাখা উচিত হবে না, মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

'তোমার কোনো প্রস্তাব আছে, জর্জ?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'রঙ্গেলো দ্বীপকে মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাই।'

'তা কিভাবে সম্ভব? আণবিক বোমা ফাটালে সোভিয়েট রাশিয়া মহা হৈ-চৈ শুরু করে দেবে। তুমি জানো, মাটির ওপর আণবিক বোমা টেস্ট করা শীঘ্রিই নিষিদ্ধ করা হচ্ছে।'

'আমরাই যে ওটা ফাটিয়েছি, তা কেউ জানবে কিভাবে? চাইনীজ মেইনল্যাণ্ডের যতোটা কাছে সম্ভব একটা মিসাইলবাহী সাবমেরিন পাঠাব আমরা, ওখান থেকে একটা নিউক্লিয়ার ওয়র-হেড ছুঁড়ে গায়েব করে দেয়া হবে রঙ্গেলোকে।'

চিন্তার গভীর রেখা ফুটে উঠল প্রেসিডেন্টের কপালে। তাকি-য়ে আছেন অ্যাডমিরালের দিকে।

'সোভিয়েটরা জানে, এই মুহূর্তে আমাদের হাতে কোনো টেস্ট প্রোগ্রাম নেই। বিস্ফোরণ এলাকার দু'হাজার মাইলের মধ্যে আমাদের বা আর কারো কোনো সারফেস শিপ বা এয়ারক্রাফট নেই, সোভিয়েটদের স্পাই স্যাটেলাইটে ধরা পড়বে চাইনীজ টেরিটরি থেকে ছোঁড়া হয়েছে মিসাইলটা।'

'কিন্তু চীনারা

'সোভিয়েটদের প্রচণ্ড অভিযোগের মুখে কি করবে চীনারা? যা নিয়ম, ওরাও পাল্টা অভিযোগ করবে। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হতে

দু'হপ্তার বেশি লাগবে বলে মনে হয় না।'

বিবেকের সাথে লড়ছেন প্রেসিডেন্ট। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। পায়চারি শুরু করলেন। তারপর হঠাৎ থামলেন অ্যাডমিরালের সামনে।

'খোদার কাছে প্রার্থনা করি,' বললেন তিনি, 'ইতিহাসে আমিই যেন শেষ মানুষ হই যে সজ্ঞানে একটা নিউক্লিয়ার বোমা হানার অনুমতি দিয়েছে।'

জানুয়ারী।

রঙ্গেলো দ্বীপ। নামেই দ্বীপ, আসলে ওটা একটা প্রবালের ছোট্ট টুকরো বৈ কিছু নয়। চারপাশে এক লক্ষ ষাট হাজার বর্গ মাইলের মধ্যে গভীর পানি ছাড়া আর কিছু নেই, পানির ওপর সামান্য একটু মাথা তুলে রয়েছে শুধু এই ক্ষুদে প্রবাল। পানি থেকে মাত্র ছয় ফুট উঁচু রঙ্গেলো, দশ মাইল দূর থেকেও দেখা যায় না।

কয়েকটা পামগাছ ছাড়া আর কিছু নেই রঙ্গেলোয়। শুধু মাঝখানে পড়ে আছে ডঃ ভিটেলি আর তার সহকারীদের কংকাল। মণিহীন চোখ তুলে অনন্তকালের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কংকালগুলো।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কমলা রঙের মেঘের ভেতর থেকে সোনালী রঙের একটা ক্ষুদে আকৃতি নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো। প্রচণ্ড গর্জন তুলে ছুটে আসছে মিসাইলটা, কিন্তু সে গর্জন রেখে আসছে পিছনে।

অকস্মাৎ চোখ ধাঁধানো নীলচে-সাদা একটা আলো কয়েক-শো মাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। বিশাল একটা আগুনের গোলক গ্রাস করে ফেলল রঙ্গেলোকে। এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে বিস্ফোরিত হলো দ্বীপটা। কমলা রঙের আলোটা টকটকে লাল হয়ে উঠছে। শক ওয়েভের ধাক্কায় আকাশের দিকে লাফ দিল সাগর। পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে উঠল ঢেউগুলো। তার-পর আগুনের গোলকটা উঠতে শুরু করল আকাশের দিকে। কয়েক মিলিয়ন টন প্রবাল এরই মধ্যে ছাই হয়ে গেছে। পাঁচ বর্গ মাইল জুড়ে ভাসছে রঙ্গেলোর অবশিষ্ট ভস্ম। এক মিনিটেরও কম সময়ে আগুনের গোলকটা এক লক্ষ পনের হাজার ফিট ওপরে উঠে গেল। ওখানে ভেসে থাকল ওটা। ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হচ্ছে, সেই সাথে বিশাল কালো ধোঁয়ায় রূপান্তরিত হচ্ছে তার চেহারা। ধীরে ধীরে সরে গেল উত্তর দিকে।

মানচিত্র থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল রঙ্গেলো দ্বীপ।

সেই সাথে কুইক-ডেথ অরগানিজম।

আলোচনা

তসলিম রেজা,
আখাউড়া, কুমিল্লা।

পরীক্ষার জন্যে বহুদিন 'সেবার' বই পড়ি নাই। অবশেষে পরীক্ষা (এস. এস. সি.) শেষ হলো। এবার নিশ্চিন্তে 'সেবা' প্রকাশনীর বইগুলি পড়লাম। ভাল লাগল আন্দেজের বন্দী, শিকার আর সবচেয়ে খারাপ লাগল 'বিষ নিঃশ্বাস', তবে সবচেয়ে ভাল লেগেছে 'সাগর কন্যা'। ধন্যবাদ সকল সেবা প্রকাশনীর লেখককে।

সহীদুল আলম বাদল,
৮৬-বি, মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা-১৯।

টার্গেট নাইন-১,২ এবং বিষ নিঃশ্বাস-১, ২ এর পরে প্রেতাত্মা-১ এর কাহিনী মোটেই ভাল লাগেনি।

০ আমি দুঃখিত।

আবদুল হান্নান তরফদার (মাসুদ),
পোঃ টেংরা বাজার, সিলেট।

আচ্ছা কাজীদা, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতে পারে এমন সব ক্ষেত্রে রক্ত বন্ধ হওয়ার বা তীব্র ব্যথা উপশমের ঔষধ কি রানা সাথে রাখতে পারে না?

০ পারে। কিন্তু রাখে না। ও জানে, আমি যতক্ষণ আছি,

যত রক্ত পড়ুক বা যত ব্যথাই লাগুক, ভয়ের কিছুই নেই।

সাহানা ফেরদৌস (সোনালী),
পশ্চিম পাড়া, গাইবান্ধা, রংপুর।

মাসুদ রানাকে আমি দারুণ ভালবাসি। ভালবাসি আমার সমস্ত চেতনা দিয়ে। এই ভালবাসায় একটুও ফাঁকি নেই।

আমার এই কথাটা চুপি চুপি 'প্রিয় রানা'কে জানিয়ে দিবেন

০ আচ্ছা।

আবিদ আমিন,
রাজিয়া সুলতানা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-৭।

...দু'ঘণ্টার মধ্যে বি. সি. আই. এর প্রত্যেকটি এজেন্ট তাদের হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ পেলো, 'কাজী আনোয়ার হোসেন নামক "লেডী কিলারের" উপর থেকে মৃত্যু পরোয়ানা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।'

কারণ 'বিষ নিশ্বাস-২' নামক ফাইলে দু'ঘণ্টা আগে খবর এসেছে B. C. I এর অবিচ্ছেদ্য অংশ সোহানা চৌধুরী বহাল তবিয়তেই আছেন।

মোঃ আক্তার হোসেন চৌধুরী,
আনছার সু স্টোর, ২৫/বি, রাজগঞ্জ, কুমিল্লা।

কাজীদা,

সদ্য প্রকাশিত সুধাময় করের 'আন্দেজের বন্দী' বইটি পড়লাম। বেশ ভাল লেগেছে। লেখককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবেন। আচ্ছা কাজীদা, বেগমের রত্নভাণ্ডার-এর লেখক শামসুদ্দিন নওয়াব আর আপনার মাঝে পার্থক্য কি? আমার ত

মনে হয় অতীতের জাহাঙ্গীর নগর আর বর্তমানের ঢাকার যতটুকু পার্থক্য ঠিক ততটুকু। জানি এই চিঠিটা আলোচনা বিভাগে ছাপা হবে না।

০ অথচ হলো।

ম্যাকজাস্টিস্ (জর্জ),
ভূতেরগলি, হাতিরপুল, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

ধন্যবাদ, আনোয়ার ভাই। এমন একটা বিষয়ের উপর লিখেছেন (বিষ-নিঃশ্বাস-১,২) যার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম অনেক অনেক দিন থেকে। (আরও যা চাইছিলাম) রানাকে অনেক অনেক দিন পর সেই পরিচিত ঢাকাতে দেখে ভাল লাগছে।

ম. এ. রশীদ,
দুর্লভপুর, কুষ্টিয়া।

শুভেচ্ছা। খুলনার কারেন্ট বুক স্টল থেকে বিষ নিঃশ্বাস-২ কিনতে গিয়ে পেয়ে গেলাম কাঙ্ক্ষিত "ধূমপান ত্যাগে আত্ম-সম্মোহন", যা আমি আর কবির আহমদ (খলিসা কুণ্ডী, কুষ্টিয়া) কয়েক মাস ধরে কোনখানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বইটা পেয়ে মনে হচ্ছে আমি যেন নিল আর্মষ্ট্রং, চাঁদে পৌঁছে গেছি, অথবা কলম্বাস, আমেরিকা আবিষ্কার করেছি; কিংবা অহংকারী কোন সুন্দরীর হৃদয় জয় করেছি। ধন্যবাদ।

০ খুশি হলাম।

বাপি, স্বপন,
বি. এম. টি. এফ, জয়দেবপুর।

বেগমের রত্নভাণ্ডার ও বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ দুইটি কাহিনীই

সুন্দর।

বইটির প্রতিটি পাতার প্রত্যেকটি লাইনে ছড়িয়ে আছে শ্বাসরুদ্ধকর রোমাঞ্চ ও কৌতুক। সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত, স্মরণীয় অনূদিত রোমাঞ্চোপন্যাসের কোঠায় সংযোজিত হল আরও একটি নাম 'বেগমের রত্নভাণ্ডার'। সাবলীল ও মনোগ্রাহী অনুবাদের জন্য অনুবাদক শামসুদ্দিন নওয়াবকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

o ধন্যবাদ।

শহিদ রেজা,
শ্রীরামপুর, কালীগঞ্জ, যশোহর।

বিষ নিঃশ্বাস ১ ও ২ পড়লাম। ভালই লেগেছে। আরো ভাল লেগেছে শিবানীকে। যদিও সে এন্টি পার্টির কর্মী, তবুও শিবানীর চেহারা, গাড়ি চালানো, পিস্তল ছোঁড়া, বন্য ষাঁড়ের সাথে সংঘর্ষ, সেক্স, বুদ্ধিমত্তা, এবং অসীম সাহস, এই সব মিলিয়ে শিবানীর সত্যিকারের রূপটা যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে সত্যিই প্রশংসা করতে হয়। বিশ্বাস করুন বাড়িয়ে বলছি না।

o ধন্যবাদ।

জামিল আখতার,
নিলটুলি, ফরিদপুর।

কুয়াশা সিরিজ সাইন্স ফিকশন গল্পের অভাব কিছুটা মিটাতো। কুয়াশা সিরিজের উপর পরবর্তী সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাবো, যদি সিদ্ধান্তটা কুয়াশা সিরিজ পুনঃ প্রকাশের পক্ষে হয়।

আস্পেজের বন্দী বইটির জন্যে সুধাময় করকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

o জানিয়ে দিলাম।

ফরহাদ আহমেদ,
২৭/২, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা—৭

মেটাল ক্যানগুলোতে লুকিয়ে আছে "লক্ষ কোটি মানুষের অনিবার্য ধ্বংস।" যাহোক এই কিউ-ডি-র একটা কূল-কিনারা হতে চলেছে জেনে আশ্বস্ত হলাম। যদিও এ ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত নই। দোহাই আপনার, হারিয়ে যাওয়া ক্যানগুলোর একটা বিহিত করবেন—গোটা মানব জাতির জন্যে ধ্বংস-লীলা ডেকে আনবেন না।

o আচ্ছা, ঠিক আছে।

খোকন,
নারিন্দা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, দশম শ্রেণী,
বিজ্ঞান বিভাগ, নারিন্দা, ঢাকা।

সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত সব বই আমি পড়ি, বিশেষ করে রকিব হাসান ও আপনার বইগুলো। মাসুদ রানার মধ্যে সেই বইগুলি বেশি ভাল লাগে, যেগুলোতে দেখতে পাই মাসুদ রানা লড়ছে বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা বিভাগের স্পাইদের সাথে। এই ধরনের বই নীলছবি, এসপিওনাজ, আমার কাছে খুব ভাল লেগেছে।

এ. কে. এম. গোলাম কুদ্দুস (বাপি),
সরকারী ভাওয়াল বদরে আলম মহাবিদ্যালয়, চান্দনা-চৌরাস্তা।

বিষ-নিঃশ্বাস-২ এর পৃষ্ঠা নং ৮১ এর একটি লাইন—"বাঁ

হাতে রাইফেল আর ডান হাতে গ্রেনেড নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাংলার মেয়ে।" কথাটির মধ্যে সামান্য ভুল রয়ে গেছে তা হল 'বাংলার মেয়ে' নয় হবে 'বাংলার ছেলে'। মূর্তিটা ছেলের, মেয়ের নয়।

যেহেতু প্রকাশের মত ভুল শোধরানো আর সম্ভব নয়। অতএব পরবর্তী সংস্করণে এ ভুলটুকু ঠিক করে দিলে পাঠককুল একটা ভ্রান্ত ধারণা থেকে রক্ষা পাবে।

টার্গেট নাইন-১ এবং ২ এর জন্য ধন্যবাদ।

○ পরবর্তী সংস্করণে ভুলটিকে শুদ্ধ করে ছাপার আশা রাখি।

মাকসুদ আলম

আরিফ বুক ডিপো, ২/৯ নূরজাহান রোড, মোঃপুর, ঢাকা।

টার্গেট নাইন-১ ও ২ এবং দুর্গম দুর্গ আমার কাছে খুব ভাল লেগেছে।

○ জেনে সুখী হলাম।

আজম খান,

পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১০।

সুধাময় করের 'আন্দেজের বন্দী'র চেয়ে ১৯৭৭ ইং সালে সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'র জাতীয় দিবস সংখ্যায় প্রকাশিত 'জীবন যেখানে যেমন' কাহিনীটিই আমার কাছে বেশি ভাল লেগেছে।

'আন্দেজের বন্দী' গ্রন্থখানার প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়। বইখানার মান বাড়িয়েছে কাহিনীর সাথে উরুগুয়ের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমি যোগ করায় এবং কাহিনীর শেষে ফেয়ারচাইল্ডের প্যাসেঞ্জার লিস্ট যোগ করায়।

প্রেতাত্মা-২

চুরি যাওয়া আটটা ওয়রহেডের মধ্যে ছয়টার সন্ধান পাওয়া গেল।

কিন্তু বাকি দুটো ?

সে দুটোর যখন খোঁজ পাওয়া গেল তখন দেরি হয়ে গেছে অনেক। বিশাল এক ব্যাটলশিপ নিয়ে অগভীর নদী বেয়ে চলে এসেছে কবীর চৌধুরী ওয়াশিংটনের কাছাকাছি।

একের পর এক ছুঁড়তে শুরু করেছে কামানের গোলা। সামরিক উপদেষ্টাদের নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বসে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। নিরুপায়। একে একে ভেঙে পড়ছে লিংকন মেমোরিয়াল, ন্যাশনাল আর্কিভ বিল্ডিং ··· হতে পারে পরের শেলটাই কুইক ডেথ এজেন্ট ভর্তি মারণাস্ত্র, লক্ষ-কোটি মানুষের অনিবার্য মৃত্যু।

তারপর ?

তারপর সত্যিই ছুঁড়ল কবীর চৌধুরী কুইক ডেথ শেল আর রানা ? রানা কি করছে তখন ?

দশ টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী